গীতা-মাধুর্য

সূচীপত্র

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ

গীতা-মাধুর্য

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥
জিজ্ঞাসাপূর্তয়ে টীকা লিখিতা সাধকস্য যা।
সঞ্জীবনীপ্রবেশায় মাধুর্যং লিখ্যতে ময়া ॥

প্রথম অধ্যায়

দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর যখন পাণ্ডবেরা পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাঁদের অর্ধেক রাজত্ব ফেরৎ চাইলেন, তখন দুর্যোধন অর্ধেক রাজত্ব তো দূরের কথা, তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগে যে জমি ধরে তা পর্যন্ত বিনাযুদ্ধে ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলেন। তখন মাতা কুন্তীর আদেশে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে পাণ্ডব এবং কৌরবের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল এবং দুই পক্ষ থেকেই যুদ্ধের পূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হতে লাগল।

মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই স্নেহবশত তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন, 'যুদ্ধ হওয়া এবং তাতে ক্ষত্রিয়দের মহা-সংহার অবশ্যম্ভাবী, এতে কেউ বাধাপ্রদান করতে সক্ষম নয়। যদি তুমি এই যুদ্ধ দেখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করতে পারি, যাতে তুমি এখানে বসে থেকেই ভালোভাবে যুদ্ধ পরিদর্শন করতে পার।' তাতে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'আমি তো জন্ম থেকেই অন্ধ, এখন নিজ চোখে আমার বংশের নিধন দেখতে চাই না, কিন্তু যুদ্ধ কীভাবে হচ্ছে—সে খবর

জানতে আমার আগ্রহ আছে।' তখন ব্যাসদেব বললেন, 'আমি সঞ্জয়কে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করছি, যাতে সে সমস্ত যুদ্ধ, সমস্ত ঘটনাবলী, সৈনিকদের মনে উদ্ভূত ভাবও জানতে পারবে, শুনতে পাবে, দেখতে পাবে এবং সমস্তই তোমাকে শোনাবে।' এ-কথা বলে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলেন। ওদিকে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হল যে, **যুদ্ধের জন্য যখন উভয়পক্ষের সেনাই প্রস্তুত সেইসময় ভগবান অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিলেন কেন?**

শোক দূর করার জন্যই ভগবান অর্জুনকে গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

অর্জুনের শোক কখন এবং কেন হয়েছিল?

অর্জুন যখন উভয়পক্ষের সেনার মধ্যে তাঁর আত্মীয়দের দেখলেন এবং ভাবতে লাগলেন যে যুদ্ধ হলে উভয়পক্ষেই আমাদের আত্মীয়রাই নিহত হবেন, তখন মমত্ববশত তিনি শোকাকুল হলেন।

উভয়পক্ষের সেনানীর মধ্যে অর্জুন তাঁর আত্মীয়দের দেখলেন কেন?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন উভয়পক্ষের সেনানীদের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করে অর্জুনকে বললেন যে, 'তুমি যুদ্ধার্থে একত্রিত এই কুরুবংশীয়দের দেখো'—তখনই তিনি তাঁর আত্মীয়দের লক্ষ্য করলেন।

ভগবান উভয়পক্ষের সেনার মধ্যে কুরুবংশীয়দের দেখতে বললেন কেন?

অর্জুন আগে ভগবানকে বলেছিলেন যে, 'হে অচ্যুত! উভয়পক্ষের সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন, যাতে আমি দেখতে পাই যে এখানে আমার সঙ্গে কারা যুদ্ধ করতে এসেছেন!'

অর্জুন কেন এমন বলেছিলেন?

যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যখন কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল, তখন উৎসাহপূর্ণ হয়ে অর্জুন ভগবানকে উভয়পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করতে বললেন।

বাদ্যগুলি কেন বাজানো হয়েছিল?

কৌরবসেনার প্রধান সেনাপতি ভীষ্ম যখন সিংহগর্জনের ন্যায় মহাবিক্রমে শঙ্খ বাজালেন, তখন কৌরবসেনাদের বাদ্যগুলি বাজানো হল এবং পাণ্ডব-সেনারাও বাদ্য বাজালেন।

ভীষ্ম কেন শঙ্খ বাদন করলেন?

দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য ভীষ্ম শঙ্খ বাদন করেন।

দুর্যোধন অসন্তুষ্ট ছিলেন কেন?

দুর্যোধন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার প্রতিপক্ষে পাণ্ডবদের সৈন্যদল অবস্থান করছে, এদের দেখুন অর্থাৎ যে পাণ্ডবদের ওপর আপনার এত স্নেহ-ভালবাসা, তারাই আপনার বিপক্ষে উপস্থিত। পাণ্ডব সৈন্যদলের ব্যূহ ধৃষ্টদ্যুম্নই রচনা করেছেন, যে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে আপনাকে বধ করার নিমিত্ত।' দুর্যোধনের সুচতুর, রাজনীতির তীক্ষ্ণ বাক্য শুনে দ্রোণাচার্য নীরব হয়েছিলেন, কোনও কথা বলেন নি, তাতেই দুর্যোধন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

দ্রোণাচার্য কেন চুপ করেছিলেন?

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে প্ররোচিত করার জন্য চাতুর্যপূর্ণ যেসব রাজনীতির কথা বলেছিলেন, দ্রোণাচার্যের সেসব ভালো লাগেনি। তিনি ভেবেছিলেন যে, 'এখন যদি এইসব কথা খণ্ডন করতে যাই, তাহলে যুদ্ধের সময় নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে, তা কখনই উচিত নয়। কিন্তু আমি ওর কথা মেনে নিতেও পারি না ; কারণ দুর্যোধনের কথাগুলি চতুরতায় ভরা, সে সরলভাবে কথাগুলি বলেনি।' তাই দ্রোণাচার্য চুপ করেছিলেন।

দুর্যোধন এইসব কথা কখন এবং কেন বলেছিলেন?

দুর্যোধন ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান পাণ্ডবসেনাদের দেখে গুরু দ্রোণাচার্যকে প্ররোচিত করার নিমিত্ত কথাগুলি বলেছিলেন। সঞ্জয় এটি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

সঞ্জয় কেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এর বর্ণনা করেছেন?

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা আরম্ভ থেকেই শুনতে চেয়েছিলেন, তাই সঞ্জয় সমস্ত কথাই সবিস্তারে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কেন সঞ্জয়ের কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন?

যুদ্ধ আরম্ভ হবার দশদিন পরে সঞ্জয় একদিন হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে জানালেন যে, 'কুরু-পাণ্ডবদের পিতামহ, শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের পতন (রথ থেকে) হয়েছে। যিনি যোদ্ধৃকুল শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ধনুর্ধারীদের থেকে কুশলী, সেই পিতামহ ভীষ্ম আজ শর-শয্যায় শায়িত অবস্থায় রয়েছেন।' এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে থাকেন। তখন তিনি

সঞ্জয়কে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানাতে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—**হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য একত্র হয়ে আমার ও পাণ্ডু-পুত্রেরা কি করল ?** ॥১॥

সঞ্জয় বললেন—সেইসময় ব্যূহরচনা করে দণ্ডায়মান পাণ্ডবসেনাদের দেখে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন যে, 'হে আচার্য! আপনি আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের তৈরি ব্যূহে এই বিরাট সংখ্যক পাণ্ডবসেনাদের দেখুন' ॥২-৩॥

পাণ্ডবদের সৈন্যদলে আমি কাদের দেখব দুর্যোধন?

পাণ্ডবদের এই সৈন্যদলে অনেক বড় বড় শূরবীর উপস্থিত, যাঁদের বড় বড় ধনুর্বাণ আছে, যাঁরা বলে ভীমের ন্যায় বলীয়ান এবং যুদ্ধে অর্জুনের ন্যায় পারদর্শী। এঁদের মধ্যে যুযুধান (সাত্যকি), রাজা বিরাট এবং মহারথী দ্রুপদও আছেন। ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং পরাক্রমশালী কাশিরাজও বিদ্যমান। পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ—এই দুই ভাই এবং মানবশ্রেষ্ঠ শৈব্যও আছেন। পরাক্রমশালী যুধামন্যু, বলবান উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এঁরা সকলেই মহারথী ॥৪-৬॥

পাণ্ডবসেনাদের শূরবীরদের নাম তো তুমি জানালে, কিন্তু দুর্যোধন আমাদের সৈন্যদলে কোন কোন শূরবীর আছেন?

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের সৈন্যদলে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন, তাঁদের লক্ষ্য করুন। আপনি (অর্থাৎ দ্রোণাচার্য), পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা এবং এঁরা ছাড়াও আরও অনেক বীর আছেন যাঁরা আমার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত, তাঁরা সকলেই শস্ত্রনিপুণ এবং যুদ্ধবিশারদ ॥৭-৯॥

সঞ্জয়, উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান বীরগণকে দেখাবার পরে দুর্যোধন কি করলেন?

দুর্যোধন মনে মনে চিন্তা করলেন যে, যেহেতু উভয়ের প্রতিই ভীষ্মের পক্ষপাতিত্ব সেইহেতু তাঁর দ্বারা রক্ষিত আমাদের সৈন্যদল পাণ্ডবদের জয় করতে সমর্থ নয় আর যেহেতু ভীমের পক্ষপাতিত্ব কেবল নিজের দিকে সেইহেতু তার দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবসেনা আমাদের জয় করতে সমর্থ ॥১০॥

মনে মনে এরূপ চিন্তা করে তারপর দুর্যোধন কি করলেন?

তিনি তখন সমস্ত যোদ্ধাদের ডেকে বললেন, 'আপনারা সকলে নিজ

নিজ ব্যূহে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সকল দিক থেকে রক্ষা করতে থাকুন'* ॥১১॥

তাঁকে রক্ষা করার কথা শুনে ভীষ্ম কি করলেন?

পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য সিংহনাদ করে অত্যন্ত জোরে শঙ্খধ্বনি করলেন ॥১২॥

ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করার পর কি হল, সঞ্জয়?

ভীষ্ম দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্যই শঙ্খধ্বনি করেছিলেন, কিন্তু কৌরব সেনাগণ সেটি যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা বলে মনে করল। তাই ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করতেই কৌরব পক্ষের শঙ্খ, ভেরী, ঢোল, মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র এক সাথে বেজে উঠল। সেই শব্দ অত্যন্ত তুমুল হয়ে উঠল ॥১৩॥

কৌরবসেনাদের বাদ্যযন্ত্র বাজার পরে কি হল, সঞ্জয়?

কৌরবসেনাদের বাদ্যযন্ত্র বাজার পর পাণ্ডবসেনাদের বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তাদের সেনারা তেমন কোনও নির্দেশ পায়নি। তখন শ্বেত-অশ্বযুক্ত মহারথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' নামক দিব্য শঙ্খ এবং অর্জুন 'দেবদত্ত' নামক দিব্য শঙ্খ অতি জোরে বাজালেন। তারপরে ভীম 'পৌণ্ড্র' নামক, যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়' নামক, নকুল 'সুঘোষ' নামক এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খ পৃথক পৃথকভাবে বাজালেন ॥১৪-১৬॥

তারপর আর কে শঙ্খ বাজালেন?

হে রাজন্! তারপর পাণ্ডবসৈন্যদের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু—এই মহারথীগণ সকলেই নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করলেন ॥১৭-১৮॥

পাণ্ডবসেনাদের সেই শঙ্খধ্বনির কি পরিণাম হল?

পাণ্ডবসেনাদের সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে গুঞ্জরিত করে অন্যায়ভাবে রাজ্যহরণকারী কৌরবদের হৃদয় বিদীর্ণ করল ॥১৯॥

---

* দুর্যোধন জানতেন যে দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মের পক্ষপাত উভয় দিকে। সেজন্য এঁদের সন্তুষ্ট করে নিজের পক্ষে আনার জন্য দুর্যোধন প্রথমে যেমন দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন, তেমনই ভীষ্মকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল বীর যোদ্ধাকে ডেকে ভীষ্মকে রক্ষা করতে বললেন।

শঙ্খধ্বনি করার পর পাণ্ডবরা কি করল, সঞ্জয়?

হে মহীপতে! শঙ্খধ্বনি হওয়ার পর যুদ্ধ আরম্ভের সময় কপিধ্বজ অর্জুন তাঁর আত্মীয় কৌরবদের দেখে গাণ্ডীব ধনুক ধারণ করে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন. 'হে অচ্যুত! আপনি আমার রথ উভয় সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন করুন' ॥২০-২১॥

রথ মধ্যস্থলে কেন রাখব অর্জুন?

আমি এই রণভূমিতে যুদ্ধাকাঙক্ষায় উপস্থিত যোদ্ধাদের একবার দেখব যে কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধে যেসব রাজন্যবর্গ দুর্যোধনের হিতাকাঙক্ষায় একত্রিত হয়েছেন, তাঁদেরও আমি দেখতে চাই ॥২২-২৩॥

অর্জুন এই কথা বললে ভগবান কি করলেন, সঞ্জয়?

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! নিদ্রাজয়ী অর্জুন এই কথা বলায় অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং সমস্ত রাজন্যবর্গের সামনে রথ স্থাপন করে বললেন, 'হে পার্থ! এখানে সমবেত কুরুবংশী লোকেদের দেখ।' ॥২৪-২৫॥

ভগবান এরূপ বলায় কি হল?

তখন অর্জুন সেই উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত পিতা, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর, সুহৃদ এবং এঁরা ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে দেখে মুহ্যমান হয়ে বিষাদ-মগ্ন স্বরে কথা বলতে লাগলেন।

অর্জুন কি বলছিলেন?

অর্জুন বলছিলেন—হে কৃষ্ণ! আপন আত্মীয়দের যুদ্ধার্থে সামনে উপস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছে, মুখ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে, শরীরে কম্প হচ্ছে, রোম খাড়া হয়ে উঠছে, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে. ত্বক জ্বালা করছে। আমার মন শুধু ঘুরছে আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না ॥২৬-৩০॥

এছাড়া আর কি দেখছ, অর্জুন?

হে কেশব! আমি অশুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আর যুদ্ধে এই আত্মীয়-স্বজনদের বধ করে আমি কোনও লাভ খুঁজে পাচ্ছি না ॥৩১॥

এঁদের বধ না করলে রাজ্য লাভ হবে কীভাবে?

হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় লাভ করতে চাই না, রাজ্য চাই না, সুখও চাই

না! হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্য লাভে, সুখভোগে অথবা বেঁচে থেকে কি লাভ? ॥৩২॥

তুমি বিজয়াদি কেন চাও না?

যাঁদের জন্য আমরা রাজ্য, সুখভোগ কামনা করি, তাঁরাই সকলে তাঁদের প্রাণ ও অর্থের মায়া ত্যাগ করে এখানে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছেন ॥৩৩॥

তাঁরা কে অর্জুন?

তাঁরা আমাদেরই আচার্য, পিতা, পিতামহ, পুত্র, মামা, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ॥৩৪॥

এঁরা যদি তোমাকেই বধ করতে উদ্যত হন, তাহলে?

যদি এঁরা আমাকে মেরেও ফেলেন, তাহলেও হে মধুসূদন! ত্রিলোকের রাজ্য লাভ হলেও, আমি এঁদের মারতে চাই না, অতএব পৃথিবীর কথা আর কি বলব ॥৩৫॥

ওরে ভাই! রাজ্য লাভ করলে তো অত্যন্ত আনন্দ হয়, তুমি কি তাও চাও না?

হে জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রের এই আত্মীয়দের (যাঁরা আমাদেরও আত্মীয়) বধ করে আমাদের কি আনন্দ হবে? এঁদের বধ করলে আমাদের পাপ তো হবেই। তাই হে মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের এই আত্মীয়দের আমি বধ করতে চাই না ; কারণ হে মাধব! নিজেদেরই আত্মীয়দের, বধ করে আমরা কি করে সুখী হব? ॥৩৬-৩৭॥

এঁরা তো তোমাকে বধ করতে প্রস্তুত, তুমি কেন পিছু হটে যাচ্ছ?

মহারাজ! লোভবশত এঁদের বিচার-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাই এঁরা (দুর্যোধনাদি) কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত পাপ দেখতে পাচ্ছেন না, তবুও হে জনার্দন! কুলক্ষয়জনিত দোষ তো আমরা জানি, সুতরাং আমাদের অবশ্যই এই পাপ থেকে দূরে থাকা উচিত। ॥৩৮-৩৯॥

যদি কুলক্ষয় হয়ই তাতে ক্ষতি কি?

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম (কুল পরম্পরা) নষ্ট হয়ে যায়।

কুলধর্ম নষ্ট হলে কি হয়?

কুলধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুল অধর্মে ভরে যায়। ॥৪০॥

অধর্মে ভরে উঠলে কি হয়?

অধর্মে ভরে উঠলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়ে ওঠে।

কুলনারী ব্যভিচারিণী হলে কি হয়?

কুলনারী ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসংকর জন্মে ॥৪১॥

বর্ণসংকর জন্মালে কি হয়?

বর্ণসংকর, কুলনাশকদের এবং সম্পূর্ণ কুলকে নরকে নিয়ে যায় এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণ লোপ পাওয়ায় তাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়। বর্ণসংকরকারকদের দোষে সনাতন কুলধর্ম, জাতিধর্ম উভয়ই নষ্ট হয়ে যায় ॥৪২-৪৩॥

যেসব মানুষের কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, তাদের কি হয়?

হে জনার্দন! আমি শুনেছি যেসব মানুষের কুলধর্ম নষ্ট হয় তারা বহুদিন নরকবাস করে ॥৪৪॥

যুদ্ধের যে এই পরিণাম তা যখন তুমি আগে থেকেই জানতে, তখন তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে কেন?

এটি অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে আমরা রাজ্য ও সুখের লোভে আত্মীয় বধ করে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি ॥৪৫॥

এবার তবে তুমি কি করতে চাও?

আমি অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে সরে যাব। তা সত্ত্বেও যদি দুর্যোধনাদি আমাকে শস্ত্রাঘাতে হত্যা করে, তবে সে মৃত্যু আমার পক্ষে হিতকারী হবে ॥৪৬॥

ঐই কথা বলে তারপর অর্জুন কি করলেন, সঞ্জয়?

সঞ্জয় বললেন—এই কথা বলে শোকব্যাকুল চিত্তে অর্জুন ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন ॥৪৭॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

রথের মধ্যস্থলে 'বসার' পর অর্জুনের কি হল, সঞ্জয়?

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! যে অর্জুন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, কিন্তু কাপুরুষতাবশত যিনি বিষাদমগ্ন এবং চোখ অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় যার দৃষ্টি অস্পষ্ট, সেই অর্জুনকে ভগবান মধুসূদন বললেন, 'হে অর্জুন! এই অসময়ে তোমার মধ্যে এমন ভীরুতা কোথা থেকে এলো? এই কাপুরুষতা

শ্রেষ্ঠ পুরুষদের যোগ্য নয়, এটি স্বর্গসুখ প্রদান করে না এবং কীর্তিও স্থাপন করে না। তাই হে পার্থ! তোমার মধ্যে এই পৌরুষহীনতা যেন না আসে ; কারণ তোমার মত পুরুষের তা হওয়া উচিত নয়। সুতরাং হে পরন্তপ! হৃদয়ের তুচ্ছ দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও' ॥১-৩॥

এই কথা শুনে অর্জুন কি বললেন, সঞ্জয়?

অর্জুন বললেন—মহারাজ! আমি মরতে একেবারেই ভয় পাই না, আমি মারতে (হত্যা করতে) ভয় পাই। তাই হে মধুসূদন! যে পূজনীয় ব্যক্তি-দের কটুবাক্যও বলা উচিত নয়, তাঁদের সঙ্গে কীভাবে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করব? ॥৪॥

আরে ভাই! কেবলমাত্র কর্তব্য পালনের কাছে আর কিছু কি আছে?

মহারাজ! এই মহানুভব গুরুজনদের বধ করার পরিবর্তে ভিক্ষান্নে জীবন-নির্বাহ করাকেও আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। যদি আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি, তাহলে গুরুজনদের বধ করে তাঁদের রুধির লিপ্ত অর্থে কামনাযুক্ত সুখভোগ করতে হবে! তাতে আমি শান্তিলাভ করব না ॥৫॥

তবে তুমি কি করা উচিত বলে মনে করছ?

হে ভগবন্! আমি বুঝতে পারছি না যুদ্ধ করা উচিত কি না এবং এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব, না ওঁরা জয়লাভ করবেন। সব থেকে বড় কথা হল এই যে ভগবন্! আমরা যাঁদের বধ করে বাঁচতেও চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের (আমাদেরও) আত্মীয়গণ সম্মুখে উপস্থিত। এঁদের আমরা কী করে বধ করব? ॥৬॥

তুমি যখন ঠিক করতে পারছ না, তখন তুমি কি উপায় ভাবছ?

হে মহারাজ! কাপুরুষতার দোষে আমার ক্ষাত্রস্বভাব অবদমিত হয়েছে, তাই ধর্ম নিরূপণে আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হচ্ছে, সেইজন্য যাতে আমার নিশ্চিতভাবে কল্যাণ হয়, তা আমাকে জানান। আমি আপনার শিষ্য এবং আপনারই শরণাগত। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।

কিন্তু মহারাজ! আপনি আগে যেমন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন তেমন আর বলবেন না ; কারণ যুদ্ধের পরিণামে এখানে ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ এবং নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ যদি হয় অথবা দেবতাদের আধিপত্য লাভ হয় তা সত্ত্বেও আমি আমার এই ইন্দ্রিয় বিশুষ্ককারী শোক যে দূরীভূত হবে—তা আমি দেখতে পাচ্ছি না ॥৭—৮॥

তারপর কি হল সঞ্জয়?

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! নিদ্রাজয়ী অর্জুন অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'আমি যুদ্ধ করব না'—একথা স্পষ্টভাবে বলে মৌনী হয়ে রইলেন ॥৯॥

অর্জুন মৌন অবলম্বন করলে ভগবান কি বললেন?

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যস্থলে বিষাদ-মগ্ন অর্জুনকে হাস্যমুখে বললেন—যার জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাই নিয়ে শোক করছ আর পণ্ডিতের মতো বড় বড় কথা বলছ ; কিন্তু পণ্ডিতেরা (তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা) মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না ॥১০—১১॥

কেন শোক করেন না, ভগবান?

আমি, তুমি এবং এইসব রাজারা যে আগে ছিলেন না—তা নয়, অর্থাৎ আমরা সকলে আগেও ছিলাম, পরেও থাকব—এই জেনে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শোক করেন না ॥১২॥

এটি কীভাবে বোঝা যায়?

আরে ভাই! দেহধারীর এই শরীরে যেমন কৌমার্য, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, তেমনই তার অন্য শরীরও প্রাপ্ত হয়। এই ব্যাপারে পণ্ডিত ব্যক্তিরা মোহগ্রস্ত হন না ॥১৩॥

কৌমার্য ইত্যাদি অবস্থা শরীর প্রাপ্ত হয়, তা ঠিক আছে, কিন্তু অনুকূল-প্রতিকূল, সুখদায়ক- দুঃখদায়ক পদার্থ যদি এসে উপস্থিত হয়, তখন কি করা উচিত, ভগবান?

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য সমস্ত বিষয় (জড় পদার্থ) অনুকূল-প্রতিকূলতার দ্বারা সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। কিন্তু সেগুলি অনিত্য অর্থাৎ আসে ও যায়, সেগুলি স্থায়ী নয়। তাই হে অর্জুন! সেসব তুমি সহ্য কর অর্থাৎ সেগুলিতে নির্বিকার থাক ॥১৪॥

সে-সব সহ্য করলে, সেগুলিতে নির্বিকার হয়ে থাকলে কি লাভ হয়?

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্জুন! সুখে-দুঃখে নির্বিকারচিত্ত যেসব ধীর পুরুষকে এইসব ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলি সুখী বা দুঃখী করে না, তাঁরা স্বতঃই অমরত্ব (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হন ॥১৫॥

সেই অমরত্ব কীভাবে অনুভব করেন?

সৎ (চেতন তত্ত্ব)-এর কখনও অভাব হয় না এবং অসৎ (জড় বস্তু)-এর

সত্তা বা স্থায়িত্ব নেই—তত্ত্বদর্শী (জ্ঞানী) মহাপুরুষগণ এই উভয় তত্ত্ব সম্যকভাবে জানেন, তাই তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন ॥১৬॥

সৎ (অবিনাশী) কি ভগবান?

যার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাকে তুমি সৎ বা অবিনাশী বলে জানবে। কেউই এই অবিনাশীকে বিনাশ করতে পারে না ॥১৭॥

অসৎ (বিনাশী) কাকে বলে ভগবান?

এই অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্য অবস্থিত দেহীর (জীবাত্মার) এইসব শরীর নশ্বর এবং বিনাশশীল। অতএব হে অর্জুন! তুমি তোমার যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম পালন কর ॥১৮॥

যুদ্ধে তো মরতে-মারতেই হয় ; অতএব যদি শরীরীকেই (দেহীকে) হন্তা বা হত বলে মনে করা হয়, তাহলে?

যে ব্যক্তি এই অবিনাশী দেহীকে দেহের ন্যায় মরণশীল বলে মনে করে এবং যে তাকে ঘাতক বলে মনে করে, তারা উভয়েই সঠিক তত্ত্ব জানে না; কারণ তিনি হত্যাও করেন না এবং স্বয়ং হতও হন না ॥১৯॥

ভগবান! শরীরী (আত্মা) কেন মরণশীল নয়?

শরীরী কখনও জন্মগ্রহণ করেন না এবং কখনও মরেন না। ইনি জন্ম-গ্রহণের দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য-বর্তমান, শাশ্বত এবং অনাদি। শরীরের মৃত্যু হলেও এঁর মৃত্যু নেই ॥২০॥

এটি জানতে পারলে কি হয়?

হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই শরীরীকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কী করে কাউকে হত্যা করতে বা করাতে সক্ষম হন? ॥২১॥

তাহলে মৃত্যু কার হয়, ভগবান?

আরে ভাই! মৃত্যু হয় শরীরের। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই শরীরী পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরে আশ্রয় নেয় ॥২২॥

নতুন নতুন শরীর ধারণ করলে তাতে কোনও না কোনও বিকার তো আসেই?

না, এতে কোনও বিকার আসে না ; কারণ শরীরীকে কোনও অস্ত্র কাটতে পারে না ; আগুন পোড়াতে পারে না ; জল ভেজাতে পারে না এবং হাওয়া

শুষ্ক করতে পারে না ॥২৩॥

কেন একে শস্ত্রাদির দ্বারা কাটা, পোড়ানো, ভেজানো বা শুষ্ক করা যায় না?

শরীরীকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, ভেজানো যায় না এবং শুষ্ক করাও যায় না ; কারণ শরীরী নিত্য বর্তমান, সর্বত্র ব্যাপ্তিরূপে পরিপূর্ণ, স্থির, অচল এবং সনাতন। শরীরী ইন্দ্রিয়াদির বিষয় নয় অর্থাৎ এঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। ইনি অন্তঃকরণেরও বিষয় নয় এবং এঁতে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না। অতএব এই শরীরীকে এরূপ জেনে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥২৪—২৫॥

শরীরীকে নির্বিকার বলে মনে করলে শোক হতে পারে না, কিন্তু বিকারশীল মনে করলে তো শোক হতেই পারে?

হে মহাবাহো! তুমি যদি শরীরীকে নিত্য জন্মায় এবং নিত্য বিনষ্ট হয় বলে মনে কর, তবুও তোমার এঁর জন্য শোক করা উচিত নয় ; কারণ যে জন্মায়, তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে মরে, তার জন্মও নিশ্চিত—এই নিয়ম কেউ রদ করতে পারে না। সুতরাং শরীরীর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয় ॥২৬—২৭॥

শরীরীর জন্য শোক করা উচিত নয়, সে-কথা ঠিক হলেও শরীরের জন্য তো শোক হয়েই থাকে, ভগবান!

শরীর নিয়েও শোক হওয়া উচিত নয় ; কারণ হে ভারত ! সকল প্রাণীই জন্মের আগে অপ্রকট ছিল, মৃত্যুর পরও অপ্রকট হয়ে যায়, শুধু মধ্যকালেই প্রকটিত থাকে। সুতরাং এতে বিলাপের কি আছে? ॥২৮॥

তাহলে শোক কেন হয়?

অজ্ঞানতার জন্য।

জানা যায় কীভাবে?

সেই জানা অর্থাৎ অনুভব করা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির দ্বারা হয় না, তাই শরীরীকে দেখা, বলা বা শোনা সবই আশ্চর্যবৎ হয়। অতএব এঁকে শ্রবণ করেও কেউ জানতে পারেন না অর্থাৎ এঁর অনুভব স্বয়ং-এর দ্বারাই হয় ॥২৯॥

তাহলে সেটি কেমন?

হে ভারত! সবার দেহে অবস্থিত এই দেহী (শরীরী) সর্বদাই অবধ্য, এ-কথা জেনে তোমার কোনও প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নয় ॥৩০॥

শোক দূর করার নানা উপায় তো আপনি জানালেন, কিন্তু আমি পাপকে ভয় পাচ্ছি, তা কি করে দূর হবে?

নিজ ধর্মের (ক্ষাত্র ধর্মের) দিকে লক্ষ্য রেখে তোমার ভীত হওয়া উচিত নয় ; কারণ ক্ষত্রিয়ের কাছে ধর্মযুদ্ধ থেকে শ্রেয় আর কিছুই কল্যাণকারক নয় ॥ ৩১॥

তবে কি ক্ষত্রিয়দের শুধু যুদ্ধ করতেই থাকা উচিত?

না ভাই! যে যুদ্ধ আপনা হতেই উপস্থিত হয়, তা ক্ষত্রিয়ের কাছে স্বর্গে যাওয়ার মুক্তদ্বার স্বরূপ। তাই হে পার্থ! যেসব ক্ষত্রিয় এরূপ যুদ্ধ লাভ করেন, তাঁরা প্রকৃতই সুখী* ॥৩২॥

এরূপ স্বতঃপ্রাপ্ত যুদ্ধ যদি আমি না করি তাহলে?

যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে তোমার ক্ষাত্রধর্ম এবং কীর্তি উভয়েরই নাশ হবে এবং কর্তব্যপালন না করার জন্য তোমার পাপ হবে ॥৩৩॥

অকীর্তি হলে কি হবে?

আরে ভাই! তুমি যুদ্ধ না করলে দেবতা, মানুষ ইত্যাদি সকলেই বহুদিন ধরে তোমার অকীর্তি ঘোষণা করবে। সেই অকীর্তি সম্মানিত ব্যক্তির কাছে মৃত্যু থেকেও অধিক দুঃখদায়ক** ॥৩৪॥

আর কি হবে ভগবান?

যে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ইত্যাদি মহারথীদের দৃষ্টিতে তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, তাদের কাছে তুমি তুচ্ছ হয়ে যাবে এবং এইসব মহারথী মনে করবেন যে তুমি মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধে বিরত হয়েছ ॥৩৫॥

ভগবান আমি কি তা সহ্য করতে পারব না?

না, তুমি তা সহ্য করতে পারবে না, কারণ তোমার শত্রুদের শত্রুতা করার সুযোগ হবে এবং তারা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অকথ্য বচন বলবে। এর থেকে দুঃখের আর কী আছে? ॥৩৬॥

---

* ভোগপ্রাপ্তি কোনও সুখ নয়, বরং তা মহাদুঃখের কারণ (৫/২২)। প্রকৃত সুখ তাকে বলে, যা দুঃখবর্জিত। দুঃখরহিত সুখ তাকেই বলে যাতে স্বধর্মরূপ কর্তব্য-কর্ম পালন করার অবকাশ পাওয়া যায়। সুতরাং যিনি কর্তব্য পালন করার সুযোগ পেয়েছেন, তিনিই বাস্তবিক সুখী এবং ভাগ্যবান।

** মৃত্যু হলেই অকীর্তি হয় না, কারণ মৃত্যু সকলেরই হয়। অকীর্তি হয় নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হলে।

আর আমি যদি যুদ্ধ করি, তাহলে?

যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তোমার স্বর্গলাভ হবে আর যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর, তাহলে সসাগরা পৃথিবীর অধিকারী হবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে উঠে দাঁড়াও ॥৩৭॥

যুদ্ধ করলে আমার পাপ হবে না তো ভগবান?

না, পাপ হয় স্বার্থবুদ্ধি থাকলে ; সুতরাং তুমি জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যুদ্ধ কর। এভাবে যুদ্ধ করলে তোমার পাপ হবে না ॥৩৮॥

যে সমবুদ্ধির সাহায্যে কর্ম করলে কোনও পাপ হয় না, তার আর কি কি বিশেষত্ব আছে ভগবান?

আমি আগেও এই সমবুদ্ধির কথা সাংখ্যযোগ প্রসঙ্গে বলেছি। এবার তুমি এটি কর্মযোগের বিষয়ে শোন—

১) এই সমবুদ্ধিযুক্ত হলে তুমি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

২) এতে আরব্ধ কর্মও নিষ্ফল হয় না।

৩) এটি অনুষ্ঠিত হলে কখনও বিপরীত ফল প্রদান করে না।

৪) এটির অল্প আচরণও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে রক্ষা করে ॥৩৯-৪০॥

আপনি যে সমত্ববুদ্ধির এতো মহিমা জানালেন, তা লাভ করার উপায় কি?

এই সমত্ববুদ্ধি প্রাপ্তির বিষয়ে ব্যবসায়াত্মিকা (পরমাত্ম-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা-সম্পন্ন) বুদ্ধি একই হয়। কিন্তু যাদের পরমাত্মপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা এক থাকে না সেইসব ব্যক্তির বুদ্ধি (নিশ্চয়তা) অনন্ত এবং বহু শাখাবিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ তারা একনিষ্ঠ হয় না) ॥৪১॥

তাদের পরমাত্মপ্রাপ্তির এক-নিশ্চয়তা হয় না কেন?

১) যারা কামনা-বাসনায় মগ্ন থাকে, ২) যারা স্বর্গকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, ৩) বেদোক্ত সকাম কর্মের প্রতিই যাদের প্রীতি, ৪) ভোগ ছাড়া আর কিছুই নেই, যারা এইসব কথা বলে ; সেইসব অবুঝ ব্যক্তিরা এইরূপ পুষ্পিত (বাইরে থেকে শোভাযুক্ত) কথা বলে থাকে, যা জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মফল প্রদান করে এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপের বর্ণনাকারী হয়। ভোগাদি বর্ণনাকারী এইসব চিত্তবিমোহনী বাক্যে যাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছে অর্থাৎ

ভোগের দিকে আকর্ষিত হয়েছে এবং যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত, সেইসব ব্যক্তির পরমাত্মাতে এক নিশ্চয়তাসম্পন্ন বুদ্ধি হয় না ॥৪২—৪৪॥

ভোগ ও ঐশ্বর্যের আসক্তি থেকে রক্ষা পেতে হলে আমার কি করা উচিত, ভগবান?

বেদ ত্রিগুণের কার্যাদি বর্ণনা করে, তাই হে অর্জুন! তুমি বেদোক্ত সকাম কর্ম রহিত হও, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বরহিত হও এবং শাশ্বত পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হও। তুমি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করার চিন্তা কোরো না, শুধু পরমাত্ম-পরায়ণ হও অর্থাৎ একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তিকেই লক্ষ্য করে রাখ ॥৪৫॥

এরূপ এক নিশ্চয়ের কি পরিণাম হয়?

বৃহৎ দীঘির খোঁজ পেলে যেমন ছোট দীঘির আর কোনও গুরুত্ব থাকে না, তেমনই বেদ এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য জানেন যেসব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বেদেরও একই তাৎপর্য থাকে অর্থাৎ তাঁদের মনে সংসার ও ভোগের কোনই গুরুত্ব থাকে না ॥৪৬॥

আমার পক্ষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত করার উপায় কি?

উপায় হল কর্মযোগ। কর্তব্য-কর্ম করাতেই তোমার অধিকার, ফলে নয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়-মন ইত্যাদি যেগুলির সাহায্যে কর্ম করা হয়, সেগুলিতে মমত্বসম্পন্ন হয়ো না।

তাহলে আমি কর্ম করব কেন?

কর্ম না করাতেও যেন তোমার আসক্তি না হয় ॥৪৭॥

তবে আমি কর্ম করব কীভাবে?

সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকাকে বলে 'যোগ', তাই হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করে যোগে (সমত্বে) স্থিত হয়ে কর্ম কর ॥৪৮॥

যদি যোগে (সমত্বে) স্থিত হয়ে কর্ম না করি, তাহলে?

সমত্ব ব্যতীত সকাম কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তাই হে ধনঞ্জয়! তুমি সমত্ববুদ্ধির আশ্রয় নাও ; কারণ যারা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করে তারা কৃপার পাত্র অর্থাৎ কর্মফলের অধীন ॥৪৯॥

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি কৃপার পাত্র হলে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মানুষই শ্রেষ্ঠ। কারণ তারা ইহজীবনেই পাপ-পুণ্য রহিত

হয়। সুতরাং তুমি সমত্বে (যোগে) স্থিত হও, কারণ কর্মে সমত্ব-ই হল সারবস্তু অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় ॥৫০॥

সমত্ববুদ্ধির পরিণাম কি হয়, ভগবান?

সমত্বযুক্ত মনীযী কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে রহিত হয়ে নির্বিকার (মোক্ষ) পদ প্রাপ্ত হন ॥৫১॥

আমি কি করে বুঝব যে আমি কর্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেছি?

তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কর্দম অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য (ভুক্ত এবং অভুক্ত) ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে ॥৫২॥

বৈরাগ্য হলে সমত্বপ্রাপ্তি কখন হয়?

শাস্ত্রাদির নানা সিদ্ধান্তে, মতপার্থক্যে বিচলিত তোমার বুদ্ধি যখন সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে অচল হবে, তখন তোমার যোগ (সাধ্যরূপ সমত্ব) প্রাপ্তি হবে ॥৫৩॥

অর্জুন বললেন—সমত্ব প্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের লক্ষণ কি?

ভগবান বললেন—হে পার্থ! সাধক যখন মনের সমস্ত কামনা বর্জন করেন এবং নিজেতেই নিজে সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন) ॥৫৪-৫৫॥

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন?

ভাই! তাঁর কথা সাধারণ ক্রিয়ারূপে হয় না, ভাবরূপে হয়। ব্যবহারকালে দুঃখ প্রাপ্তিতে যিনি উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখে যিনি বিগতস্পৃহ, যিনি রাগ-ভয়-ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, সেই মননশীল ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। যিনি সকল ব্যাপারে আসক্তিশূন্য এবং প্রারব্ধবশত প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না, তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে অর্থাৎ তিনি যে স্থির নিশ্চয় করেছেন যে—'আমাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি করতেই হবে'—তা সিদ্ধ হয় ॥৫৬-৫৭॥

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে উপবেশন করেন, ভগবান?

কচ্ছপ যেমন নিজ পদ চতুষ্টয়, গলা এবং পুচ্ছ সঙ্কুচিত করে বসে, তেমনই কর্মযোগীর বুদ্ধি যখন স্থির হয়, তখন তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে বিষয় থেকে সংহরণ করে অবস্থান করে থাকেন ॥৫৮॥

ইন্দ্রিয় সংহরিত হবার প্রকৃত লক্ষণ কি?

ইন্দ্রিয়গুলিকে তার বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলে দেহাভিমানী ব্যক্তির

বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও রসবুদ্ধি (সুখ-ভোগ বুদ্ধি) দূর হয় না। কিন্তু সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়-কামনা নিবৃত্ত হয় ॥৫৯॥

রসবুদ্ধি থাকলে কি ক্ষতি হয়?

হে কৌন্তেয়! রসবুদ্ধি থাকলে সাধনে যত্নশীল বিবেকী মানুষেরও প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় ॥৬০॥

ভগবান, এই বিষয়াসক্তি দূর করার জন্য কি করা উচিত?

কর্মযোগী সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে আমার শরণাগত হয়ে অবস্থান করেন অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। এরূপ যাঁর ইন্দ্রিয় বশীভূত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৬১॥

আপনার শরণাগত না হলে কী হবে?

আমার শরণাগত না হলে বিষয়াদির (ভোগাদির) চিন্তা হয়।

বিষয়াদির চিন্তা হলে কী হয়?

মানুষের সেই বিষয়ে আসক্তি হয়।

আসক্তি হলে কী হয়?

আসক্তি হলে ঐ বিষয় প্রাপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়।

কামনা (আকাঙ্ক্ষা) উৎপন্ন হলে কী হয়?

কামনা পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥৬২॥

ক্রোধ উৎপন্ন হলে কী হয়?

ক্রোধ উৎপন্ন হলে সম্মোহ হয় অর্থাৎ মূঢ়তা আসে।

মূঢ়তা এলে কী হয়?

'আমি সাধক, আমার এইরূপ ব্যবহার করা উচিত, এরূপ বলা উচিত'—ইত্যাদি আগে যে সিদ্ধান্ত ছিল, সেই স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি আর স্মরণে থাকে না।

স্মৃতিভ্রংশ হলে কী হয়?

বুদ্ধি (নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি) নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়—সেই বিবেচনার শক্তি অবদমিত হয়।

বুদ্ধি নষ্ট হলে কী হয়?

বুদ্ধি নষ্ট হলে সেই ব্যক্তির পতন হয় ॥৬৩॥

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থানের কথা তো আপনি বললেন, এখন বলুন তিনি কীভাবে বিচরণ করেন?

ভাই! তাঁর বিচরণও ক্রিয়ারূপে নয়, ভাবরূপেই হয়ে থাকে। যে সাধকের চিত্ত বশীভূত এবং রাগ-দ্বেষ মুক্ত, তিনি সেই বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় উপভোগকরত চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন ॥৬৪॥

চিত্তের প্রসন্নতা প্রাপ্তি হলে কী হয়?

চিত্তের প্রসন্নতা জন্মালে মানুষের সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং সেই ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ করে ॥৬৫॥

কার বুদ্ধি স্থির হয় না?

যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত নয়, সেই ব্যক্তির ব্যবসিত (এক নিশ্চয়সম্পন্ন) বুদ্ধি হয় না, সেইজন্য তাঁর 'আমাকে কেবল নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে'—এরূপ চিন্তা বা বুদ্ধি হয় না। এরূপ চিন্তা না হওয়ায় অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন না করায় তিনি শান্তি পান না, সুতরাং এই অশান্ত মানুষ সুখ পাবেন কোথায় ॥৬৬॥

যে ব্যক্তি সংসারী (ভোগী), তাঁর তো বুদ্ধি স্থির হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই ; কিন্তু যিনি সাধক, তাঁর বুদ্ধি স্থির না হওয়ার কারণ কি?

কারণ হল, যেমন জলের উপরে নৌকাকে বায়ু আন্দোলিত করে তেমনই সাধকের বিষয়ে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হয় সেই একই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত সংলগ্ন মন বুদ্ধিকে হরণ করে নেয় ॥৬৭॥

তাহলে কার বুদ্ধি স্থির হয়?

হে মহাবাহো! যাঁর ইন্দ্রিয় সর্বপ্রকারে বশ হয়েছে অর্থাৎ যিনি মনে মনেও বিষয় চিন্তা করেন না, তাঁরই বুদ্ধি স্থির হয় ॥৬৮॥

যাঁদের ইন্দ্রিয় বশে নেই, সেই সাধারণ মানুষে আর যাঁদের ইন্দ্রিয় বশে আছে, সেই সংযমী মানুষের মধ্যে তফাৎ কি?

সাধারণ ব্যক্তিদের কাছে যা রাত্রি অর্থাৎ যাঁরা পরমাত্মপ্রাপ্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিদ্রিত, সংযমী ব্যক্তি তাতে জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন, আর সাধারণ মানুষ যাতে জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ ভোগ বাসনা ও সংগ্রহে খুবই সজাগ, সাবধান থাকেন, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ মননশীল ব্যক্তির কাছে তা রাত্রির ন্যায়, অন্ধকার সমাকুল ॥৬৯॥

তাহলে সেইসব সংযমী ব্যক্তির কাছে ভোগ্য-পদার্থ আসেই না?

আসে, কিন্তু সমুদ্র যেমন নিজ মহিমায় অটলভাবে বিরাজ করে এবং চারিদিক থেকে জলপূর্ণ নদী এসে তাতে বিলীন হলেও তাতে কোনও বিক্ষেপ উৎপন্ন হয় না, তেমনই এইসব সংযমী ব্যক্তির নিকট সাংসারিক নানাপ্রকার ভোগ্য পদার্থ এলেও, এতে তাঁদের চিত্তে কোনওপ্রকার বিক্ষেপ উদিত হয় না।এরূপ ব্যক্তিই পরমশান্তি (পরমাত্মতত্ত্ব) প্রাপ্ত হন, ভোগ কামনাকারীগণ নন ॥৭০॥

ভোগকামনাকারীগণ কী করে শান্তিলাভ করবেন?

একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই তাঁরা শান্তিলাভ করতে পারেন। যেসব ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ হয়ে অহংবোধ ও মমতাশূন্য হয়ে বিচরণ করেন, তাঁরাই শান্তিলাভ করেন ॥৭১॥

অহংবোধ ও মমতাশূন্য হলে তাঁরা কোথায় অবস্থান করেন?

তাঁরা ব্রহ্মে অবস্থান করেন। হে পার্থ! একেই বলা হয় ব্রাহ্মীস্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে, মানুষ কখনও মোহগ্রস্ত হয় না। মানুষ যদি মৃত্যুর সময়েও এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন অর্থাৎ মৃত্যুকালেও যদি অহংবোধ ও মমতাশূন্য হন তাহলেও তিনি নির্বাণ (শান্ত) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥৭২॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! আপনার মতে যখন বুদ্ধি (জ্ঞান)ই শ্রেষ্ঠ, তাহলে হে কেশব! আপনি কেন আমাকে এই ভীষণ কর্মে নিযুক্ত করছেন? আবার আপনি কখনও বলছেন—কর্ম কর, কখনও বলছেন জ্ঞানকে আশ্রয় কর। আপনার এই মিশ্রবাক্যে আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হচ্ছে। অতএব নিশ্চিত করে এমন একটি কথা বলুন, যাতে আমার কল্যাণ হয় ॥১-২॥

ভগবান বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন। আমি বলেছি এই জগতে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে। তাতে সাংখ্যযোগীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে এবং কর্মযোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা হয় অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয় যোগের সাহায্যে একই সমত্ব প্রাপ্তি হয় ॥৩॥

সমত্বলাভের জন্য কি কর্ম করা একান্তই আবশ্যক?

হ্যাঁ, অবশ্যই ; কারণ মানুষ কর্ম প্রচেষ্টা না করলেই নৈষ্কর্ম্য লাভ করে না এবং কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। তাৎপর্য হল এই যে সমত্ব প্রাপ্তি কর্মারম্ভ না করলেও হয় না এবং কর্মত্যাগ করলেও হয় না ॥৪॥

কর্ম ত্যাগ করলে হয় না কেন?

কোনও ব্যক্তিই কোনও অবস্থাতে ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না ; কারণ প্রকৃতিজনিত গুণ স্বভাবের বশবর্তী প্রাণীদের কর্মে বাধ্য করে, অতএব প্রাণী কর্ম কী করে ত্যাগ করবে? ॥৫॥

মানুষ যদি চুপ করে বসে থাকে, কোনও কিছু না করে, তবে কি তাকে কর্ম ত্যাগ বলে না?

না, যে ব্যক্তি চুপ করে বসে অর্থাৎ কেবল বাহ্যত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ করে, মনে মনে বিষয়াদি চিন্তা করে তার এই চুপ করে বসে থাকা কর্ম ত্যাগ করা নয়, বরং মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এটি এক মিথ্যাচার ॥৬॥

আপনি যে সমত্ববুদ্ধির কথা বলেছেন তার প্রাপ্তি কর্ম না করলেও হয় না, কর্ম ত্যাগ করলেও হয় না এবং বাহ্যত চুপচাপ অবস্থান করে মনে মনে বিষয় চিন্তা করলেও হয় না, তাহলে তা কি করে প্রাপ্ত করা যায়?

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি মনে মনে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে আসক্তিরহিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কর্মযোগের (নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যকর্মের) আচরণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁর সমত্ববুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। অতএব তুমি শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিয়তকর্ম কর ; কারণ কর্ম না করার থেকে উপরোক্তরূপে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করা শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া কর্ম না করলে তোমার শরীর-নির্বাহ করাও সম্ভব হবে না ॥৭-৮॥

হে ভগবান। কর্ম করলে বন্ধন হবে না তো?

না। যজ্ঞ (কর্তব্য-কর্ম) শুধু নিজের জন্য করলেই মানুষ তার দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। তাই হে কৌন্তেয়! তুমি অনাসক্ত হয়ে শুধুমাত্র কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্যই কর্ম কর ॥৯॥

আমার কর্ম করার প্রয়োজনই বা কি?

আরে ভাই! সর্গের (সৃষ্টির) প্রারম্ভে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞের (কর্তব্য-কর্মের) বিধানসহ জীব সৃষ্টি করে তাদের বলেছিলেন—তোমরা এই কর্তব্য-কর্মরূপ

যজ্ঞের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের কর্তব্য পালনের অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করুক ॥১০॥

এই যজ্ঞ আমরা কি মনোভাব রেখে করব, পিতামহ?

এর সাহায্যে তোমরা দেবগণের সংবর্ধন কর এবং দেবগণও তোমাদের অনুগৃহীত করুন। এইভাবে একে অন্যকে বৃদ্ধিতে সাহায্য করলে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম না করে কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে তোমরা পরমশ্রেয়কে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হবে ॥১১॥

পিতামহ! যদি আমরা যজ্ঞ না করি, তাহলে?

তোমাদের কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবগণ তোমাদের না চাইতেই কর্তব্য পালনের অভীষ্ট বস্তু প্রদান করবেন ; কিন্তু তোমরা যদি সেইসব অভীষ্ট বস্তুর দ্বারা দেবগণের পুষ্টসাধন না করে নিজেরাই ভোগ কর, তাহলে চোর অপবাদ প্রাপ্ত হবে ॥১২॥

কী করে এই দোষ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, ভগবান?

ভাই! শুধু অন্যের হিতার্থে কর্তব্য-কর্ম করলেই যজ্ঞের অবশেষরূপে সমত্ব অনুভূত হয়। সেই সমত্ব অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু যিনি কেবল নিজের সুখের জন্য কর্ম করেন, সেই পাপাত্মাগণ শুধু পাপই অর্জন করেন ॥১৩॥

ভগবান, এতক্ষণ আপনি কর্তব্য-কর্মের ব্যাপারে ব্রহ্মার নির্দেশ শোনালেন, এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হল যে, সৃষ্টি-চক্র পরিচালনার জন্যও কর্তব্য-কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা থাকে ; কারণ সকল প্রাণীই অন্ন থেকে উদ্ভূত হয়, অন্ন উৎপন্ন হয় বৃষ্টিধারা থেকে। বৃষ্টি হয় যজ্ঞ (কর্তব্য পালন) থেকে এবং যজ্ঞ সম্পন্ন হয় নিষ্কাম-ভাবযুক্ত কর্তব্য-কর্মের দ্বারা। কর্তব্য-কর্মের বিধি বর্ণিত হয়েছে বেদে এবং বেদ প্রকটিত হয়েছেন পরমাত্মা থেকে। তাই সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে (কর্তব্য-কর্মে) নিত্য বিরাজ করেন অর্থাৎ কর্তব্য পালন দ্বারাই তাঁকে প্রাপ্ত করা যায়। সুতরাং সৃষ্টি-চক্র সুরক্ষার জন্য নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন ॥১৪-১৫॥

যদি কোনও ব্যক্তি সৃষ্টি-চক্র সুরক্ষার নিমিত্ত নিজ কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে?

হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই সৃষ্টি-চক্র পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্য কর্তব্য

পালন করে না, ইন্দ্রিয় ভোগাসক্ত এবং পাপজীবন যাপনকারী সেই ব্যক্তি জগতে বৃথাই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ সে মরে গেলেই ভাল ॥১৬॥

কোনও ব্যক্তি অনাসক্ত হয়ে আপনার নির্দেশানুসারে সৃষ্টি-চক্র পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যেই যদি কর্তব্য-কর্ম করেন, তাহলে?

তিনি আপনাতে আপনি রমণকারী, তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট থাকেন। তখন তাঁর আর কিছু করা বাকি থাকে না ; কেননা সেই মহাপুরুষের জগতে আর কোনও কর্তব্য থাকে না, কোনও কর্ম করারও প্রয়োজন থাকে না এবং কোনও প্রাণীর সঙ্গেই তাঁর কোনও প্রকার স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে না ॥১৭-১৮॥

আমিও কি এরূপ হতে পারি, ভগবান?

নিশ্চয়ই। তুমি নিরন্তর অনাসক্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য-কর্ম পালন কর ; কেননা অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য-কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে ॥১৯॥

এর আগে কেউ কি এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেছেন এবং তিনি কি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন?

হ্যাঁ, রাজা জনকের মতো অনেক মহাপুরুষই কর্তব্য-কর্মের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করেছেন। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেও তাঁরা লোকসংগ্রহের (জগৎকে কুমার্গ থেকে সম্মার্গে নিয়ে যাওয়ার) জন্য কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও লোকসংগ্রহের কথা মনে রেখে নিজ কর্তব্য-কর্ম কর ॥২০॥

লোকসংগ্রহ কেমন করে হয়?

লোকসংগ্রহ দু'প্রকারে হয়—নিজ কর্তব্য পরায়ণতার দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেমন ব্যবহার কবেন, অন্য সাধারণ ব্যক্তিও সেইরূপ আচরণ করেন। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য বলে প্রচার করেন, সাধারণ ব্যক্তিরা তারই অনুবর্তন করেন ॥২১॥

আপনি পরমাত্মপ্রাপ্তির বিষয়ে যেমন জনকাদির উদাহরণ দিয়েছেন, লোকসংগ্রহের বিষয়ে এরূপ কোনও উদাহরণ কি আছে?

তুমি আমার উদাহরণই নিতে পার পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই এবং প্রাপ্ত করার মতো কোনও অপ্রাপ্ত জিনিসও নেই, তা সত্ত্বেও আমি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম করে যাই ॥২২॥

আপনার কর্তব্য-কর্ম করার কি প্রয়োজন, ভগবান?

প্রয়োজন আছে পার্থ ; কারণ আমি যদি নিরলস হয়ে কর্ম না করি তাহলে

মানুষ আমাকেই সর্বভাবে অনুসরণ করবে অর্থাৎ কর্তব্য-কর্ম করা ছেড়ে দেবে ॥২৩॥

তাতে কি হবে, ভগবান?

যদি আমি কর্তব্য-কর্ম না করি, তাহলে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম না করার ফলে এইসব মানুষ উচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং আমি সর্বপ্রকার বর্ণ সঙ্করাদি দোষ উৎপাদনকারী এবং এই সমস্ত প্রজাদের ধ্বংসের কারণ হব ॥২৪॥

তাহলে আপনার পক্ষে লোকসংগ্রহার্থে কর্তব্য-কর্ম করা তো অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদেরও কি কর্তব্য-কর্ম করা প্রয়োজন?

হ্যাঁ অর্জুন, অত্যন্ত প্রয়োজন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন আসক্তিবশত ফলাকাঙ্ক্ষায় তৎপর হয়ে কর্ম করেন, তেমনিই অনাসক্ত জ্ঞানী মহাত্মাগণের লোকসংগ্রহার্থে তৎপরতাপূর্বক কর্ম করা উচিত। জ্ঞানী মহাত্মাগণের সেই কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোনও প্রকার বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন না করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজে কর্ম করা এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সেরূপ কর্ম করানো উচিত ॥২৫-২৬॥

জ্ঞানী ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি—উভয়ের কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি?

সকল কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণাদির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অহংবোধে মোহিত চিত্তের অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন যে 'আমি কর্তা', আর হে মহাবাহো! গুণ-বিভাগ এবং কর্ম-বিভাগকে* তত্ত্বত জানেন যেসব জ্ঞানী মহাপুরুষ তাঁরা 'সমস্ত গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয় অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতিতে সংঘটিত হয়'—এটি অনুভব করে সেগুলিতে আসক্ত হন না ॥২৭-২৮॥

আপনার ওপর যত দায়িত্ব আছে, জ্ঞানী মহাপুরুষদেরও কি ততই দায়িত্ব থাকে?

না, জ্ঞানী মহাপুরুষগণের তো অজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো কর্ম না করলেও চলে কিন্তু তিনি যেন কোনওপ্রকারেই প্রকৃতির গুণে মোহিত এবং গুণ-কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচলিত না করেন ॥২৯॥

---

* সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের কার্য হওয়ায় শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, পদার্থ ইত্যাদি সমস্ত জগৎ-ই 'গুণ-বিভাগ' এবং তাতে সংঘটিত সকল ক্রিয়াই 'কর্ম-বিভাগ'।

কিন্তু প্রভু আমি তো বিচলিত হই, তাহলে কী করব?

তুমি বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করে কামনা, মমতা ও শোকবর্জিত হয়ে যুদ্ধ (কর্তব্য-কর্ম) কর ॥৩০॥

সমস্ত কর্তব্য-কর্ম আপনাকে অর্পণ করলে কি হবে?

যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার মত অনুসরণ করেন, তিনি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন ॥৩১॥

কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার মত অনুসরণ করেন না, তাঁর কি হয়?

যে ব্যক্তি আমার এই মতে দোষ দর্শন করে সেই অনুসারে চলেন না, সেই সাংসারিক জ্ঞানে মোহিত এবং পারমার্থিক জ্ঞানবর্জিত অবিবেচক ব্যক্তিকে বিনষ্ট বলেই জেনো ॥৩২॥

আপনার মতানুসারে না চললে তাঁদের পতন কেন হয়?

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ রাগ-দ্বেষ বর্জিত শুদ্ধ প্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়া করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা নিজ রাগ-দ্বেষ যুক্ত দূষিত স্বভাব অনুসারে কর্ম করে, তাই শাস্ত্র মর্যাদা অনুসারে কর্ম করাতে তারা সমর্থ হয় না, জোর চলে না। এইরূপে তারা নিজ কলুষ স্বভাবের বশীভূত হওয়ায় তাদের পতন ঘটে ॥৩৩॥

এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি, ভগবান?

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে রাগ-দ্বেষ, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা থাকে, সুতরাং মানুষ যেন রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কর্ম না করে ; কারণ ঐগুলিই মানুষের শত্রু ॥৩৪॥

তাহলে মানুষের কি কিরা উচিত?

নিজ (স্ব) ধর্ম পালন করা উচিত। গুণাদি কম হলেও নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্ম পালন-কালে যদি মৃত্যুও ঘটে, তবে তা (ধর্ম-পালন) কল্যাণ-কারক হয়। কিন্তু পরধর্ম যতোই গুণসম্পন্ন হোক, তা মহা ভয় প্রদান করে ॥৩৫॥

অর্জুন বললেন—যদি নিজ ধর্ম পালন করাই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে মানুষ না চাইলেও কার দ্বারা বলপূর্বক প্রেরিত হয়ে অধার্মিক, পাপাচরণ করে? ॥৩৬॥

ভগবান বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন কাম (কামনা)ই এই পাপ কাজে প্রবৃত্ত করায় বলে জেনো। এই কাম থেকেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এটি অত্যন্ত

দুষ্পূরণীয় এবং মহাপাপ, সুতরাং তুমি একে শত্রু বলে জানবে ॥৩৭॥

এই মহাপাপী কাম কি করে?

ধোঁয়া যেমন অগ্নিকে, ময়লা যেমন দর্পণকে এবং জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করে, তেমনই কাম পাপ না করার চেষ্টাকে অবদমিত করে মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করে এবং হে কৌন্তেয়, এটি অগ্নির ন্যায় কখনও তৃপ্ত হয় না এবং বিবেকী সাধকদের নিত্য শত্রু। এই কামের দ্বারা মানুষের বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ॥৩৮-৩৯॥

এই কাম কোথায় থাকে?

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি—কাম এই তিন স্থানে অবস্থান করে এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে দেহাভিমানী মানুষের জ্ঞান আবৃত করে তাকে মোহিত করে ॥৪০॥

কী করে এই কামকে নাশ করা যায়?

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! তুমি সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান আবৃতকারী মহাপাপী কামকে অতি অবশ্যই বিনাশ কর ॥৪১॥

আপনি যে উপায় জানালেন, তা কি করে কার্যকরী করা সম্ভব, ভগবান?

শরীরের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বলবান, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়াদির থেকে পর হল মন, মনের থেকে বুদ্ধি পর এবং বুদ্ধির থেকে কাম পর*। এইভাবে কামকে বুদ্ধির থেকে পর জেনে নিজেই নিজেকে বশীভূত করে, হে মহাবাহো! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর ॥৪২-৪৩॥

❖ ❖ ❖

* কাম অহং-এ (কর্তা-তে) অবস্থান করে, তাই কর্তার পদার্থাদিতে আকর্ষণ হয়। অহং-এ প্রকৃতির (জড়) অংশ এবং পরমাত্মার (চেতন) অংশ থাকে। প্রকৃতির অংশ স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির দিকে এবং পরমাত্মার অংশ স্বাভাবিকভাবে (সজাতীয় হওয়ায়) পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করে। তাই অহং-এর জড় অংশে থাকে কাম আর চেতন অংশে থাকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, প্রেম-পিপাসা ইত্যাদি।

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

আপনি এতক্ষণ কর্মযোগে যে কামনা বিনাশের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন, সেই কর্মযোগের ক্রমপ্রবাহ কি?

ভগবান বললেন—আমি এই অবিনাশী যোগের কথা সর্বপ্রথম সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য তাঁর পুত্র মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। হে পরন্তপ! এইরূপে ক্রমপ্রবাহে আসা এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ায় মনুষ্যলোকে এই যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, তাই যা অত্যন্ত উত্তম সেই পুরাতন যোগের কথা আজ তোমাকে বলছি, যা অত্যন্ত উত্তম গুহ্য তত্ত্ব ॥১-৩॥

অর্জুন বললেন—কিন্তু হে ভগবান! আপনি যে সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই সূর্য তো অনেক আগেই উৎপন্ন হয়েছেন, কিন্তু আপনার জন্ম তো এখন (তার পরে) হয়েছে। তাহলে কি করে বুঝব যে আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন ॥৪॥

ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন! এটি আমার এই জন্মের ব্যাপার নয়। আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হয়েছে। আমি সে সবই জানি অর্থাৎ কোন কোন জন্মে আমি এবং তুমি কি কি করেছি, সেগুলি আমি জানি, কিন্তু তুমি সেইসব জন্ম এবং কর্মের কথা জান না ॥৫॥

আমার জন্ম যেরূপ হয়েছে, আপনার জন্ম কি সেরূপ হয়নি?

না ভাই! আমি জন্মরহিত, অবিনাশী (অবিনশ্বর) এবং সকল প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজ যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটিত হই ॥৬॥

আপনি কোন সময়ে প্রকটিত হন?

হে ভারত! যেই যেই সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সেই সময়ই আমি অবতার রূপ গ্রহণ করি ॥৭॥

আপনার অবতারত্ব গ্রহণ করার প্রয়োজন কি?

সাধু (ভক্ত)-দের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম ঠিকমতো সংস্থাপন করার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥৮॥

বারংবার এইভাবে জন্ম (অবতার রূপ) গ্রহণ করায় আপনি কি বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হন না?

না অর্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম উভয়ই দিব্য। নিজের কোনও স্বার্থ চিন্তা না করে জগতের হিতের জন্যই আমি প্রকটিত হই। যাঁরা তত্ত্বত একথা জানেন তাঁরা দেহত্যাগের পরে আর জন্মগ্রহণ করেন না—আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৯॥

তাঁরা যে আপনাকেই প্রাপ্ত হন—তার প্রমাণ কি?

যাঁরা আমাতেই মদ্‌গতচিত্ত, আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেন এরূপ ব্যক্তিরা জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম তত্ত্বত জেনে পবিত্র হয়ে বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধশূন্য হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥১০॥

তাঁরা কি মনোভাব নিয়ে আপনার শরণ গ্রহণ করেন?

হে পার্থ! সংসার বিমুখ যে মানুষ যে মনোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি তাঁর সঙ্গে সেই মতই ব্যবহার করে থাকি। আমার এই ব্যবহারের প্রভাব জগতের সকল মানুষের ওপরই পড়ে, যার ফলে তাঁরাও স্বার্থবুদ্ধি এবং অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে অন্যের হিতার্থে তৎপর হন ॥১১॥

আপনি আপনার শরণাগতদের এত অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেন আপনাকে ছেড়ে দেবগণের উপাসনা করে থাকে?

তাঁদের মধ্যে সাংসারিক আসক্তি আসায় তাঁরা কর্মে সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই তাঁরা আমাকে ছেড়ে দেবগণের উপাসনা করেন। কারণ ইহলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্রই লাভ করা যায় ॥১২॥

মানুষ যেমন কর্মজনিত সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে দেবতাদের উপাসনা অর্থাৎ শুভকর্ম করেন, আপনিও কি তেমন কোনও ফলের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকেন?

জীবেদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি চারবর্ণে, (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ভাগ করি। কিন্তু আমি এই সৃষ্টি-রচনা প্রভৃতির কর্মগুলি কর্তৃত্ব ও ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করেই করি, তাই এইসব কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। শুধু তাই নয়, এইপ্রকার তত্ত্বের দ্বারা যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরাও কখনও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না।* ॥১৩-১৪॥

---

* ভগবান যেমন ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে কর্ম করেন, আমাদেরও তেমনই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্ম করতে হবে—এরূপ জেনে যিনি কর্ম করেন, তিনি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না।

আর কেউ কি এভাবে কর্ম করেছেন?

হ্যাঁ, এর আগে যাঁরা মুমুক্ষু ছিলেন, তাঁরাও এইরূপ (কর্মের তত্ত্ব) জেনে কর্ম করেছেন। তাই তুমিও পূর্বসূরীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মগুলি তাঁদের মতই কর ॥১৫॥

মুমুক্ষুগণ যে কর্ম করেছেন আর যে কর্ম করতে আপনি আদেশ দিচ্ছেন, সেই কর্ম কি?

কর্ম কি আর অকর্ম কাকে বলে—এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও মোহগ্রস্ত হন। অতএব আমি সেই কর্ম-তত্ত্ব তোমাকে জানাচ্ছি, যা জানলে তুমি এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। এই কর্ম তিনপ্রকার—কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম। এই তিনটির তত্ত্ব জানা অত্যন্ত প্রয়োজন ; কেননা কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ় ॥১৬-১৭॥

কর্ম এবং অকর্মের তত্ত্বকে কি করে জানা যায়?

কর্মে অকর্ম দেখা এবং অকর্মে কর্ম দেখা অর্থাৎ কর্ম করার সময় নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্তভাবে থেকে কর্ম করা—এইভাবে যিনি কর্ম করেন, তিনিই যোগী এবং বুদ্ধিমান ॥১৮॥

সেই বুদ্ধিমত্তা কি ?

যাঁদের সমস্ত কর্ম সংকল্পরহিত ও কামনাশূন্য এবং যাঁদের সকল কর্ম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত, তাঁদের জ্ঞানীগণও পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান বলে থাকেন, এই হল তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ॥১৯॥

এরূপ ব্যক্তির কেমন স্থিতি হয়?

তিনি কর্ম এবং কর্ম ফলাসক্তি পরিত্যাগ করে সর্বদা নিজেতেই তৃপ্ত থাকেন। তাই তিনি সকল কর্মে প্রবৃত্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না ॥২০॥

কোনও সাধক যদি নিবৃত্তি-পরায়ণ হয়, তাহলে?

শরীর এবং চিত্ত সংযতকারী, সর্বপ্রকার সংগ্রহ পরিত্যাগকারী এবং সাংসারিক আশা-রহিত সাধক শরীর দ্বারা কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না ॥২১॥

আর যদি কোনও সাধক প্রবৃত্তি-পরায়ণ হয়, তাহলে?

তিনিও যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব বর্জিত হন এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে কর্ম করায় কর্মে আবদ্ধ হন না। কেবল তাই নয়, যিনি আসক্তিশূন্য এবং স্বাধীন, যিনি শুধুমাত্র পরমাত্মাকে

প্রাপ্ত করতে দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছেন, এরূপ যজ্ঞকারী সাধকের সকল কর্মই বিনষ্ট হয়ে যায় ॥২২-২৩॥

যজ্ঞ কয় প্রকারের ভগবান?

১) যাতে সমস্ত করণ, উপকরণ, সামগ্রী, ক্রিয়া, কর্তা ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে, তাকে বলা হয় 'ব্রহ্মযজ্ঞ'।

২) যাতে সকল পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করা হয়, তাকে বলা হয় 'ভগবদর্পণরূপ যজ্ঞ'।

৩) যে যজ্ঞে সাধক নিজেই নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক করে করে দেন, তাকে বলা হয় 'অভিন্নতারূপ যজ্ঞ'।

৪) যাতে সাধক তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে নেন, সেগুলিকে তাদের নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে আনেন, তাকে বলা হয় 'সংযম-রূপ যজ্ঞ'।

৫) সাধক যত রাগ-দ্বেষবর্জিত ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে বিষয় উপভোগ করেন, তাকে বলা হয় 'বিষয়-হরণরূপ যজ্ঞ'।

৬) প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের ক্রিয়া রুদ্ধ করে, বুদ্ধিকে সজাগ রেখে নির্বিকল্প হওয়াকে বলা হয় 'সমাধিরূপ যজ্ঞ'।

৭) অন্যের উপকারার্থে নিজ অর্থ ব্যয় করাকে বলা হয় 'দ্রব্যযজ্ঞ'।

৮) নিজ ধর্ম পালন করাতে যতোই কষ্ট হোক, সেটি প্রসন্নতা-সহকারে সহন করাকেই বলা হয় 'তপোযজ্ঞ'।

৯) কার্যের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে নির্বিকার থাকাকেই বলা হয় 'যোগযজ্ঞ'।

১০) বেদ-শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠন এবং নাম জপ করাকে বলা হয় 'স্বাধ্যায়-রূপ জ্ঞানযজ্ঞ'।

১১) পূরক, কুম্ভক এবং রেচকপূর্বক* প্রাণায়াম করাকে বলা হয় 'প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ'।

১২) নিয়মিত আহার করে প্রাণাদিকে নিজ নিজ স্থানে রুদ্ধ করে রাখাকে বলা হয় 'স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ'।

---

* নিঃশ্বাস গ্রহণ করাকে বলা হয় পূরক, সেই নিঃশ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করে রাখাকে বলা হয় কুম্ভক এবং সেটি পরিত্যাগ করাকে বলা হয় রেচক।

এই সমস্ত যজ্ঞই শুধুমাত্র কর্ম হতে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য, এরূপ জেনে যেসব সাধক এইসব যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁদের সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায় ॥২৪-৩০॥

পাপ নাশ হলে কি হয় ভগবান?

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! এইসব যজ্ঞকারীরা অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। কিন্তু যারা যজ্ঞই করে না, তাদের কাছে এই মনুষ্যলোকও লাভজনক হয় না, তাহলে পরলোক কী করে তাদের পক্ষে লাভজনক হতে পারে? ॥৩১॥

আর কোথায় এইসব যজ্ঞের বর্ণনা আছে?

এরূপ আরও বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা বেদে আছে। সেইসব যজ্ঞগুলি কর্মজনিত (কর্ম থেকে হয়) বলে জানবে। এইরূপ জেনে যজ্ঞ করলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে ॥৩২॥

এইসব যজ্ঞের মধ্যে কোন যজ্ঞটি শ্রেষ্ঠ ভগবান?

হে পরন্তপ! এইসব কর্মজনিত যজ্ঞাদির থেকে 'জ্ঞানযজ্ঞ' শ্রেষ্ঠ ; কারণ জ্ঞানযজ্ঞে সমস্ত কর্ম এবং পদার্থ সমাপ্ত (ভস্মসাৎ) হয় ॥৩৩॥

জ্ঞান (যজ্ঞ) কী করে প্রাপ্ত করা যায়?

জ্ঞানলাভ করার জন্য তুমি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে যাও। তাঁদের পায়ে প্রণাম করে, সেবা করে, তাঁদের কাছে সশ্রদ্ধভাবে তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করবে, তখনই সেই জ্ঞানী মহাত্মাগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন ॥৩৪॥

তাঁদের প্রদত্ত জ্ঞানে কী হয়?

হে অর্জুন! সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তোমার আর কখনও মোহ প্রাপ্তি হবে না এবং এই জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখতে পাবে অর্থাৎ সর্বত্র একই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করবে ॥৩৫॥

এই জ্ঞানের আর কি মহিমা আছে?

যদি তুমি সমস্ত পাপীর চেয়েও অধিক পাপী হও তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে পার হয়ে যাবে ॥ ৩৬ ॥

নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পার হলেও যেমন সমুদ্র থেকেই যায়, তেমনই পাপ থেকে উত্তীর্ণ হলেও পাপ তো থেকেই যাবে?

না অর্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাঠের রাশিকে সম্পূর্ণভাবে ভস্ম করে দেয়, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নি সম্পূর্ণ কর্ম (পাপরাশি) ভস্ম করে

ফেলে। অতএব ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নেই। সেই জ্ঞানকে কর্মযোগে সিদ্ধ-পুরুষ অবশ্যই নিজেই নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন। ॥৩৭-৩৮॥

কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ যে জ্ঞান আপনিই প্রাপ্ত হন, সেই জ্ঞান অন্যান্য সাধকেরা কীভাবে লাভ করেন?

ইন্দ্রিয় সংযতকারী, সাধন-পরায়ণ এবং শ্রদ্ধাবান সাধক জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করে তাঁরা অতিশীঘ্রই পরমশান্তি লাভ করেন ॥৩৯॥

জ্ঞানপ্রাপ্তির পথে বাধা কি?

যিনি নিজে কিছু জানেন না এবং অপরকে শ্রদ্ধা করেন না, অন্যের কথায় বিশ্বাস রাখেন না, সংশয়াকুল চিত্ত, এরূপ ব্যক্তির পতন হয়। এরূপ সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তির ইহলোকেও সুখ হয় না, পরলোকেও নয় ॥৪০॥

সংশয় দূর হলে কি হয়?

হে ধনঞ্জয়! যিনি সমত্বের সাহায্যে সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক ছেদ করেছেন এবং জ্ঞানের (কর্মতত্ত্বের জ্ঞানের) সাহায্যে সমস্ত সংশয় দূর করেছেন, এরূপ স্বরূপ-পরায়ণ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করে না। সুতরাং হে ভরত! তুমি চিত্তে স্থিত অজ্ঞান-জাত সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমত্বে স্থিত হও এবং যুদ্ধের (কর্তব্য পালনের) জন্য প্রস্তুত হও ॥৪১-৪২॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ! আপনি কখনও কর্ম ত্যাগের অর্থাৎ সাংখ্যযোগের প্রশংসা করছেন, আবার কখনও কর্মযোগের। সুতরাং এই সাধন দুটির মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে কল্যাণকর, সেটি আমাকে বলুন ॥১॥

ভগবান বললেন—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—উভয়ই শ্রেষ্ঠ। তবুও এই দুয়ের মধ্যে সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥২॥

কর্মযোগ কেন শ্রেষ্ঠ, ভগবান?

হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি কাউকে রাগ বা দ্বেষ করেন না সেই কর্মযোগীকে

নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে ; কেননা দ্বন্দ্বরহিত হওয়ায় তিনি অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন ॥৩॥

আপনি বলছেন যে উভয়েই শ্রেষ্ঠ, তবে কি উভয়ের ফলপ্রাপ্তিতে কোনও পার্থক্যই থাকে না?

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে পৃথক পৃথক ফলদানকারী বলে থাকেন, পণ্ডিত (বুদ্ধিমান) ব্যক্তিরা তা বলেন না ; কারণ এই দুইয়ের যে কোনও একটিতে স্থিতিলাভ করলে সাধক দুটি ফলই লাভ করেন অর্থাৎ সাংখ্যযোগী যে ফল প্রাপ্ত করেন, কর্মযোগীও সেই ফল প্রাপ্ত করেন। অতএব যিনি ফলরূপে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে একইরূপ দেখেন, তিনি ঠিকই দেখেন ॥৪-৫॥

যদি উভয়ের ফলই এক হয়, তাহলে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ কেন?

হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম না হয়ে সাংখ্যযোগে সিদ্ধিলাভ করা (সমত্ব লাভ করা) অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মননশীল কর্মযোগী (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব লাভ করে) শীঘ্রই সমত্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥৬॥

কর্মযোগী কী করে কর্মযোগের সাহায্যে ব্রহ্মলাভ করেন?

জিতেন্দ্রিয়, নির্মল চিত্ত, সংযত দেহ এবং সকল প্রাণীতে নিজেকে অনুভব করেন যে কর্মযোগী, তিনি কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥৭॥

সাংখ্যযোগী কীভাবে কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন?

সৎ-অসতের তত্ত্ব জেনে সৎ-এ স্থিত হয়ে সাংখ্যযোগী ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসগ্রহণ, কথা-বলা, মল-মূত্র ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু খোলা ও বন্ধ করাকেও —'ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে'— এরূপ মনে করেন এবং 'আমি (স্বয়ং) কিছুই করি না'—এটি অনুভব করে তিনি কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন ॥৮-৯॥

কর্মযোগী এবং সাংখ্যযোগী—উভয়েই কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন। এরূপ নির্লিপ্ত থাকার আর কোনও উপায় আছে কি?

আছে, তা হল ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগী পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ কর্ম ভগবানে অর্পণ করে কর্ম করেন। অতএব তিনিও জলে পদ্মপত্রের মত পাপে, কর্মে লিপ্ত হন না ॥১০॥

ভগবান! ভক্তিযোগী তো আপনাকে সমর্পণের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন। সুতরাং তিনি লিপ্ত হন না ; কিন্তু কর্মযোগী কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করেন, যাতে তিনি লিপ্ত হন না?

কর্মযোগী ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, বুদ্ধিতে মমত্ববোধ না রেখে এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু চিত্ত-শুদ্ধির জন্যই কর্ম করে থাকেন। তাই ফলের ইচ্ছা না থাকায় তিনি চিরশান্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি যোগী নন, তিনি কামনাবশত কর্মফলে আসক্ত হয়ে আবদ্ধ হন ॥১১-১২॥

সাংখ্যযোগী কীভাবে কর্ম করেন, ভগবান?

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করে সাংখ্যযোগী পুরুষ মনে মনে সমস্ত কর্ম নবদ্বারযুক্ত শরীরে ন্যস্ত করে সুখে নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি নিজে কোনও কিছু করেন না এবং কাউকে দিয়ে কিছু করান না ॥১৩॥

সাংখ্যযোগী তো কর্ম করেন না এবং করানও না, কিন্তু পরমাত্মা তো করান?

পরমাত্মা কারও কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না এবং কাউকে কোনও কর্মে নিযুক্ত করেন না আর কর্মফলের সঙ্গে কারও কোনওরূপ সম্পর্কও স্থাপন করেন না। কিন্তু মানুষ তার আপন স্বভাব অনুসারেই কর্ম করে আর নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। তাই কর্মফলের সঙ্গে স্বতঃই তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ॥১৪॥

পরমাত্মা কারও কর্তৃত্বাদি তো সৃষ্টি করেন না, কিন্তু প্রাণীদের কর্মফল কি গ্রহণ করেন?

ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মা কারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; কিন্তু অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় জীব মোহগ্রস্ত হয় অর্থাৎ তারা নিজেদের কর্মগুলির কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় ॥১৫॥

তাহলে সকল প্রাণীই কি এইরূপ নিজেকে কর্তা-ভোক্তা মনে করে মোহগ্রস্ত হতে থাকেন?

না, যাঁরা জ্ঞান (বিবেক)-এর সাহায্যে অজ্ঞানকে বিনষ্ট করেছেন, তাঁদের সেই সূর্যের ন্যায় জ্ঞান তাঁদের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব রহিত করে পরমাত্মতত্ত্বকে প্রকাশিত করে দেয় অর্থাৎ তাঁদের সেই তত্ত্ব অনুভব করায় ॥১৬॥

এই পরমাত্মতত্ত্ব আর কে অনুভব করেন?

যাঁদের মন এবং বুদ্ধি তাঁতেই নিবিষ্ট, যাঁদের অবস্থান পরমাত্মতত্ত্বেই এরূপ

পরমাত্মপরায়ণ সাধক জ্ঞানের সাহায্যে পাপ-পুণ্য রহিত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন। তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না ॥১৭॥

যাঁরা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন, সেইসব মহাপুরুষদের ব্যবহারিক জ্ঞান কেমন হয়?

সেই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল ; গো, হস্তী এবং কুকুরের মধ্যেও এক সমরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বা অন্যান্য লৌকিক ব্যবহারে তাদের সঙ্গে একই রকমের ব্যবহার করেন না ॥১৮॥

সমদর্শী হলে কি হয়?

যাঁর মন সর্বদা সাম্যে অবস্থিত অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত, তিনি ইহজীবনেই জগৎ-জয় করেছেন অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করেছেন। কারণ ব্রহ্ম সম এবং নির্দোষ, তাই সমদর্শী পুরুষগণ এই ব্রহ্মে অবস্থান করেন ॥১৯॥

এই সাম্যাবস্থা লাভের উপায় কি?

ব্যবহারকালে প্রিয়-অপ্রিয় ও অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলেও যিনি হৃষ্ট বা শোকগ্রস্ত হন না, সেই মোহবর্জিত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই পরমাত্মাতে অবস্থান করেন ॥২০॥

কীভাবে এই স্থিতি প্রাপ্ত করা যায়, ভগবান?

যিনি বাহ্য বিষয়সমূহে আসক্তি বর্জিত, তিনি প্রথমে নিজের মধ্যে স্থিত সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন। তারপর তিনি পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব হয়ে অক্ষয় সুখ অনুভব করেন ॥২১॥

বাহ্য বিষয়ের আসক্তি থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়?

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সংযোগে যেসব ভোগ (সুখ) উদ্ভূত হয়, তা সবই দুঃখের কারণ এবং আদি-অন্তবিশিষ্ট (আসে এবং যায়)। সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাতে আসক্ত হন না ॥২২॥

যেসব ব্যক্তি ঐ ভোগসমূহে আসক্ত হন না, তাঁদের বিশেষত্ব কি?

যেসব ব্যক্তি দেহত্যাগের পূর্বেই কাম-ক্রোধের বেগ সংযত করতে সক্ষম হন অর্থাৎ কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হতেই দেন না, তাঁরা সুখী, তাঁরা যোগী এবং তাঁরাই সার্থক ব্যক্তি ॥২৩॥

এরূপ হলে কি হয়?

কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন না হওয়ায় তাঁরা পরমাত্মতত্ত্বের সুখ অনুভব

করেন, সেই তত্ত্বেই রমণ করেন এবং তাঁদের সর্বদা জ্ঞান জাগ্রত থাকে। এভাবে ব্রহ্মস্বরূপ সাধকগণ শান্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥২৪॥

আর কে সেই শান্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন?

যাঁদের দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে, যাঁরা সর্বভূতে হিতে নিরত, যাঁদের মন সংশয় মুক্ত এবং যাঁদের সব পাপ দূর হয়েছে, এইরূপ বিবেকশীল সাধক নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করেন ॥২৫॥

যাঁরা নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তাঁদের লক্ষণ কি?

তাঁরা কাম-ক্রোধ হতে সর্বতোভাবে মুক্ত সংযত চিত্ত, স্বরূপ দর্শনকারী হন, এই সাংখ্যযোগীগণ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে সেই নির্বাণ ব্রহ্মে অবস্থান করেন ॥২৬॥

অন্য সাধনার দ্বারাও কি নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করা যায়?

হ্যাঁ, ধ্যানযোগের সাহায্যে সম্ভব। বাহ্য-বিষয়কে বাহিরেই বহিষ্কৃত করে অর্থাৎ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করে, নিঃশ্বাসের প্রাণ ও অপান-বায়ুর গতি সমান রেখে, যাঁর মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে, এরূপ ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ বর্জিত মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদাই মুক্ত ॥২৭-২৮॥

অন্য কোনও সহজ সাধন কি আছে, যার সাহায্যে সহজেই মুক্ত হওয়া যায়?

হ্যাঁ আছে, তা হল ভক্তিযোগ। যাঁরা আমাকে সর্বলোকের মহেশ্বর, সকল প্রাণীর পরম সুহৃদ (স্বার্থরহিত দয়ালু, প্রেমিক) এবং সকল যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা বলে জানেন, দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেন অর্থাৎ নিজেকে কখনই ভোক্তা বলে মনে করেন না, তাঁরাও এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন ॥২৯॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান বললেন—আমি কর্মযোগের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি, এখন কর্মযোগের সার কি জানাচ্ছি। যে ব্যক্তি কর্মফলের অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল বিষয়সমূহের আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য-কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধুমাত্র অগ্নি এবং ক্রিয়া-কর্ম ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না। তাই হে অর্জুন! লোকে যাকে সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) বলে, তাকে তুমি যোগ (কর্মযোগ) বলে জানবে ॥১॥

সন্ন্যাসী এবং যোগীদের মাহাত্ম্য কিসের?

সংকল্প ত্যাগের ; কেননা সংকল্প ত্যাগ না করে কোনও ব্যক্তিই যোগী হতে পারে না ॥২॥

যোগী হওয়ার প্রধান কারণ কি?

যোগে আরোহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিষ্কামভাবে কর্ম করাই হল (যোগারূঢ় হওয়ার) কারণ আর সেই যোগারূঢ় ব্যক্তির শান্তি হল পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ সংসার ত্যাগের দ্বারা প্রাপ্ত শান্তি উপভোগ না করাই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির কারণ ॥৩॥

যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ কি?

যাঁর ইন্দ্রিয় ভোগে ও কর্মে আসক্তি থাকে না এবং যিনি নিজের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তাঁকেই যোগারূঢ় পুরুষ বলা হয় ॥৪॥

যোগারূঢ় হতে হলে মানুষের কি করা উচিত?

নিজেকেই নিজের উদ্ধার করতে হয়, পতন হতে দিতে নেই ; কারণ নিজেই নিজের বন্ধু আবার নিজেই নিজের শত্রু ॥৫॥

নিজে কী করে নিজের বন্ধু বা শত্রু হয়?

যিনি নিজেকে নিজে জয় করেছেন অর্থাৎ অসতের সঙ্গে সম্পর্ক যিনি মানেন না, তিনিই নিজে নিজের মিত্র বা বন্ধু আর যিনি নিজেকে জয় করতে পারেন নি অর্থাৎ অসতের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন, তিনি নিজেই নিজের শত্রু ॥৬॥

নিজেই নিজের মিত্র হলে কি হয়?

যিনি নিজেকে জয় করেছেন, প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা, কর্মের সাফল্য-অসাফল্য ও অন্যের কৃত মান-অপমানে নির্বিকার থাকেন, তিনিই পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥৭॥

যাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করেন তাঁদের লক্ষণ কি, ভগবান?

তাঁদের চিত্ত সর্বদাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত থাকে, তাঁরা জিতেন্দ্রিয় হন, সকল পরিস্থিতিতে নির্বিকার থাকেন, মৃৎ-পিণ্ড, পাথর ও সোনাতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হন—এরূপ যোগীকে সমত্ব-যুক্ত বলা হয়। শুধুমাত্র পদার্থাদিতেই নয়, সুহৃদ-মিত্র-শত্রু-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধু-সাধু ও পাপী ব্যক্তিদের মধ্যেও যারা সম-বুদ্ধি বজায় রাখেন, সেই সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ ॥৮-৯॥

সমবুদ্ধি কি শুধু কর্মযোগের দ্বারাই হয়, না অন্য সাধনার সাহায্যেও হয়?

সমবুদ্ধি ধ্যানযোগের সাহায্যেও হয়, আমি তাই এবার ধ্যানযোগের নিয়ম জানাচ্ছি। ধ্যানযোগী সুখভোগের জন্য সম্পদ-সংগ্রহ ত্যাগ করে, কামনাবর্জিত হয়ে, চিত্ত ও শরীরকে বশীভূত করে নির্জনে একলা থেকে মনকে সর্বদা পরমাত্মাতে সমাহিত করবেন ॥১০॥

মনকে পরমাত্মাতে সমাহিত করার জন্য অর্থাৎ ধ্যান করার পক্ষে উপযোগী বিষয় কি?

শুদ্ধ, পবিত্র স্থানে ধ্যানোপযুক্ত কুশ, মৃগচর্ম এবং পবিত্র বস্ত্র ক্রমশ বিছাতে হবে। সেই আসন অতি উচ্চ বা অতি নিম্নে অবস্থিত হবে না এবং সমতল স্থানে রাখতে হবে ॥১১॥

এরূপ আসন পেতে কী করতে হবে?

এই আসনে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বশে রেখে, মন একাগ্র করে চিত্তশুদ্ধির জন্য ধ্যানযোগের অভ্যাস করবে ॥১২॥

আসনে কীভাবে বসা উচিত?

শরীর, মস্তক, ঘাড় একভাবে সোজা, স্থির রেখে, অন্যদিকে মন না দিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে বসতে হবে ॥১৩॥

এই আসনে কোন ভাব নিয়ে বসা উচিত?

যিনি রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব জয় করেছেন, নির্ভয় এবং ব্রহ্মচর্য পালন করেন,

এরূপ সতর্ক যোগী মন-সংযম করে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে মৎপরায়ণ হবেন ॥১৪॥

এর ফল কি?

এইভাবে মনকে সর্বদা আমাতে নিবিষ্ট করে বশীভূত চিত্তবিশিষ্ট যোগী আমাতে স্থিত পরম শান্তি প্রাপ্ত হন ॥১৫॥

অনেকেই তো এইভাবে ধ্যান করেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই কেন ধ্যানযোগে সিদ্ধ হন না, ভগবান?

হে অর্জুন! যাঁরা অতিভোজী এবং যাঁরা একান্ত অনাহারী, যাঁরা অত্যন্ত নিদ্রালু এবং যাঁরা একেবারেই নিদ্রা যায় না, এই যোগে তাঁরা সিদ্ধ হন না ॥১৬॥

কে এই যোগে সিদ্ধ হন?

যাঁর আহার (খাওয়া) এবং বিহার (ঘোরা-ফেরা) যথোচিত, যাঁর কর্ম-প্রচেষ্টা যথোচিত এবং যাঁর শয়ন-জাগরণ যথোচিত, তিনিই এই দুঃখ নাশকারী যোগে সিদ্ধ হন ॥১৭॥

দুঃখ নাশকারী এই যোগ কখন সিদ্ধ হয়?

চিত্ত যখন বিশেষভাবে সংযত হয়ে নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে এবং স্বয়ং সমস্ত বস্তুতে বিমুখ হয়ে যায় অর্থাৎ নিজের জন্য কোনও বস্তু আবশ্যক বলে মনে করা হয় না, তখনই তাঁকে যোগী বলা হয় অর্থাৎ তাঁর যোগ সিদ্ধ হয়ে যায় ॥১৮॥

তখন যোগীর চিত্তের অবস্থা কেমন হয়?

বায়ুহীন স্থানে অবস্থিত প্রদীপের শিখা যেমন অচঞ্চল থাকে, তেমনই ধ্যানযোগ অভ্যাসকারী যোগীর চিত্তও স্থির থাকে ॥১৯॥

চিত্তের এরূপ স্থিতি হলে কি হয়?

যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধ চিত্ত যখন সমাধি-সুখে বিরত হয়ে যায় তখন যোগী নিজেকেই নিজের মধ্যে স্থিত দেখে আপনাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় ॥২০॥

নিজেতে নিজে সন্তুষ্ট হলে কি হয়?

সীমাহীন, ইন্দ্রিয়ের আগোচর, বুদ্ধিগ্রাহ্য যে সুখ, যোগী তাই অনুভব করেন। এরূপ প্রকৃত সুখে অবস্থিত হয়ে এই যোগী কখনও নিজ স্বরূপ থেকে বিচলিত হন না ॥২১॥

তিনি কেন বিচলিত হন না?

যে সুখ তিনি প্রাপ্ত হন, তার থেকে বড় কোনও সুখ আছে বলে

তিনি মনে করেন না এবং এতে অবস্থান করে মহাদুঃখেও তিনি বিচলিত হন না ; কেননা তিনি যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে সুখের অবধি থাকে না এবং দুঃখ তার নাগাল পায় না ॥২২॥

এই অলৌকিক সুখ প্রাপ্তির জন্য কি করা কর্তব্য?

যাতে দুঃখের সংস্পর্শেরই বিয়োগ হয় অর্থাৎ যাতে সংসারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হয়, তাকেই 'যোগ' বলা হয়। এরূপ যোগ উদ্বেল না হয়ে সুনিশ্চিতভাবে চিত্তে ধারণ করা উচিত ॥২৩॥

স্ব-স্বরূপের ধ্যানে যে যোগ (সাধ্যরূপ সমত্ব) প্রাপ্তি হয়, তা প্রাপ্ত করার আর কি কি উপায় আছে?

অন্য উপায় হ'ল নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যান। সংকল্প হতে উৎপন্ন কামনা-গুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করে, ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে ধীরে ধীরে সংসার থেকে বিরত হবে এবং সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মাতে মন-বুদ্ধি স্থির করে অন্য কোনও কিছুই চিন্তা করবে না ॥২৪-২৫॥

যদি অন্য চিন্তা এসে যায় তাহলে?

অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ মন যে যে স্থানে যাবে সেইস্থান থেকে সরিয়ে এনে একমাত্র পরমাত্মাতেই নিবিষ্ট করতে হবে ॥২৬॥

তাতে কি হবে?

রজোগুণ-বৃত্তি বর্জিত, প্রশান্ত চিত্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ যোগী উত্তম সাত্ত্বিক সুখ প্রাপ্ত হন ॥২৭॥

তারপরে কি হয়?

নিজেকে সর্বদা পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করায় সেই নিষ্পাপ যোগী সহজেই ব্রহ্মস্বরূপ নিরতিশয় সুখলাভ করেন ॥২৮॥

আপনি এতক্ষণ সগুণ-সাকারের, নিজ স্বরূপের এবং নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানযোগীদের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা জগৎকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন, তা বর্ণনা করেন নি। ভগবান, আপনি এবার বলুন, স্ব-স্বরূপের ধ্যানযোগীরা এই জগৎকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

এইরূপ ধ্যানযোগযুক্ত যোগী নিজ স্বরূপকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখেন এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজ স্বরূপে দেখেন, তাই তাঁকে সমদর্শী বলা হয় ॥২৯॥

যিনি আপনার সগুণ-সাকার রূপের ধ্যান করেন, তিনি এই জগৎকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

তিনি সর্বত্র আমাকে দেখেন এবং আমাতে সর্বভূতের অবস্থান দেখেন, তাই আমি তাঁর কাছে অদৃশ্য থাকি না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না ॥৩০॥

আপনি এবং যোগীগণ—একে অপরের কাছে কেন অদৃশ্য হন না?

তিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমার সঙ্গে এক হয়ে আমারই ভজনা করেন, তাই তিনি সকলের সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করলেও নিরন্তর আমাতেই অবস্থান করেন। তাহলে আমরা একে অপরের কাছে অদৃশ্য হব কী প্রকারে? তাই আমরা পরস্পরে অদৃশ্য হতে পারি না ॥৩১॥

যিনি আপনার নির্গুণ-নিরাকার স্বরূপের ধ্যান করেন, তিনি এই জগৎকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নিজ শারীরিক সুখ-দুঃখকে নিজের বলে মনে করেন, তেমনই এই যোগী সর্ব প্রাণীর সুখ-দুঃখকে নিজের বলে দেখে থাকেন, তাই সেই যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় ॥৩২॥

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন! এতক্ষণ আপনি সমত্ব প্রাপ্তির জন্য যে ধ্যানযোগের বর্ণনা করলেন, মনের চঞ্চলতার জন্য সেই ধ্যানযোগে স্থির থাকা আমার দুঃসাধ্য বলে মনে হয় ; কারণ হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী, দৃঢ় এবং অনমনীয়। একে আবদ্ধ করা বায়ুকে আবদ্ধ করার মতই কঠিন বলে আমি মনে করি। ॥৩৩-৩৪॥

ভগবান বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ! মহাবাহো, সত্যিই এই মন অত্যন্ত চঞ্চল আর একে আবদ্ধ করে রাখাও দুঃসাধ্য। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে একে বশীভূত করা সম্ভব। তাই যার মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি নিজ বশে নেই, তার পক্ষে ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন, এবং যাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত, তাদের পক্ষে ধ্যানযোগে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব—এই হল আমার মত ॥৩৫-৩৬॥

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ! যাঁর সাধনায় শ্রদ্ধা আছে কিন্তু যত্নে শৈথিল্য এসেছে, এরূপ সাধকের অন্তকালে যদি সাধনায় মতি না থাকে, তাহলে তিনি যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না করে কোন গতি লাভ করেন? সাংসারিক আশ্রয়বর্জিত এবং পরমাত্মসাধনায় বিচলিত এইসব উভয়ভ্রষ্ট সাধক কি ছিন্ন

মেঘের ন্যায় ভেসে যান? হে কৃষ্ণ! আপনিই আমার এই সন্দেহ দূর করতে সক্ষম ; আপনি ছাড়া অন্য কেউই আমার এই সন্দেহ দূর করতে সক্ষম নন ॥৩৭-৩৯॥

ভগবান বললেন—পার্থ! ঐসব সাধকের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও পতন হয় না ; কারণ হে প্রিয়তম! কল্যাণকর কর্ম করেন যেসব সাধক, তাঁদের কখনও দুর্গতি হয় না ॥৪০॥

তাঁদের যদি দুর্গতি না হয়, তবে তাঁরা কোন গতি প্রাপ্ত হন?

যে সাধকের চিত্তে সাংসারিক ভোগের যৎসামান্য কামনা থাকে, সেরূপ যোগভ্রষ্ট সাধক পুণ্যকর্মকারীদের লোকে (স্বর্গাদি উচ্চলোকে) গমন করেন ও সেখানে বহুকাল সুখভোগ করে ইহলোকে শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেন। কিন্তু যাঁর চিত্তে সাংসারিক ভোগবাসনা থাকে না অথচ অন্তকালে কোনও বিশেষ কারণবশত যোগভ্রষ্ট হয়ে যান, তিনি স্বর্গাদিলোকে না গিয়ে তখনই কোনও তত্ত্বজ্ঞ যোগীর গৃহে জন্ম নেন। এইপ্রকার জন্ম ইহলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ॥৪১-৪২॥

তত্ত্বজ্ঞ যোগীকুলে জন্মলাভ করলে কি হয়?

হে কুরুনন্দন! সেইস্থানে তাঁর পূর্বজন্মের কৃত সাধনসামগ্রী অতি সহজেই প্রাপ্ত হয়, যার ফলে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সচেষ্ট হতে পারেন ॥৪৩॥

তত্ত্বজ্ঞ যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারীদের কথা তো আপনি জানালেন, এখন শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের কি হয় তাই আমাকে জানান?

সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ভোগাদির বশ হলেও পূর্বজন্মের কৃত অভ্যাসের (সাধনার) বশে পরমাত্মাতে আকর্ষিত হন।

পূর্বাভ্যাসে এমন কোন শক্তি আছে, যার ফলে তিনি সাধনাতে এত জোরের সঙ্গে আকর্ষিত হন?

ভাই! যোগ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিও যখন বেদ-কথিত সকাম কর্ম অতিক্রম করেন, তাহলে যিনি যোগভ্রষ্ট, যোগে যুক্ত তাঁর কথা আর বলার কি আছে ॥৪৪॥

পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হলে কি হয়?

তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় ব্যাপৃত হন এবং সম্পূর্ণ

পাপবর্জিত হয়ে সেই অনেক জন্ম-সিদ্ধ সাধক পরমগতি পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥৪৫॥

যে যোগী পরমগতি প্রাপ্ত হন, তাঁর মহিমা কি?

তিনি সকাম-ভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ—এই হল আমার অভিমত। তাই হে অর্জুন! তুমিও যোগী হও ॥৪৬॥

যোগীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ কে?

যে ব্যক্তি মদ্‌গত চিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে আমার সর্বদা সাধন-ভজন করেন সেই ভক্তই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥৪৭॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়

আপনি যাঁকে যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, আমি কি তেমন হতে পারি?

অবশ্যই পার।

কেমন করে?

ভগবান বললেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে আসক্ত হয়ে, আমার শরণ গ্রহণ করে, আমার ভজনা করলে নিঃসন্দেহে আমার স্বরূপ জানতে সক্ষম হবে। তুমি কীভাবে আমার স্বরূপ জানতে পারবে তা আমার কাছ থেকে শোন। সেই সর্ব বিভূতিসম্পন্ন স্বরূপ জানার জন্য আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে জানাচ্ছি, যা জানলে তোমার ইহলোকে আর কিছু জানার শেষ থাকবে না ॥১-২॥

তাই যদি হয়, তাহলে সকলেই কেন আপনার এই সর্ববিভূতিসম্পন্ন রূপের কথা জেনে নেয় না?

এরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত মানুষ খুব কমই হয়। কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে কোনও একজন হয়ত নিজ কল্যাণের জন্য যত্নশীল হয়। সেই যত্নশীল সাধকদের মধ্যে কোনও একজনই আমার সমগ্ররূপ তত্ত্বত জানতে পারেন ॥৩॥

আপনার সেই সমগ্ররূপ কেমন?

হে মহাবাহো! পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—আমার অপরা (জড়) প্রকৃতি এই আট ভাগে বিভক্ত। এর থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন আমার জীবরূপ 'পরা' (চেতন) প্রকৃতি, যার দ্বারা (অহং-মমত্বর দ্বারা) এই জগৎকে ধারণ করে রাখা হয়েছে। এই অপরা ও পরা—দুই প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়।

এর মূল কারণ কে ভগবান?

আমিই এই জগতের মূল কারণ ; (কেননা) জগৎ আমা-হতেই উৎপন্ন হয় এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। হে ধনঞ্জয়! আমি ছাড়া এই জগতের অন্য কোনও বিন্দুমাত্র কারণ নেই। যেমন সূতায় তৈরি গুটিগুলি সূতোয় গাঁথা হলে সেই মালাতে যেমন সবই সূতো, জগতে তেমনি একমাত্র আমিই আছি ৷৷৪-৭৷৷

কিন্তু আমি সে-কথা বুঝবো কী করে ভগবান?

হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, সূর্য ও চন্দ্রের প্রভা আমি, সর্ববেদের ওঁকার আমি, আকাশের শব্দ আমি, মানুষের যে পৌরুষ তাও আমি, পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ আমি, অগ্নিতে আমিই তেজ, সমস্ত প্রাণীর জীবনী শক্তি বা প্রাণ আমি, তপস্বীগণের তপও আমি। হে পার্থ! আমাকেই সমস্ত প্রাণীর সনাতন বীজ বলে জেনো। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুদ্ধি এবং তেজস্বী ব্যক্তিদের তেজও আমিই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন। বলবান ব্যক্তিদের কামনা-বাসনা বর্জিত সাত্ত্বিক বলও আমি। আমি মানুষের ধর্মময় কাম। এ ছাড়াও যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে—সে সকল আমা হতেই উৎপন্ন বলে জেনো ; কিন্তু আমি সে সবে অবস্থিত নই অর্থাৎ আমি সেগুলির অতীত (স্বাধীন) এবং নির্লিপ্ত ৷৷৮-১২৷৷

তাই যদি হয়, তবে সকলেই কেন আপনাকে সেইরূপে জানতে পারে না?

তারা সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের মোহে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ সংসারে নিমগ্ন হয়ে থাকে। তাই তারা ত্রিগুণের অতীত আমার অবিনাশী স্বরূপ জানতে পারে না ৷৷১৩৷৷

আপনাকে তাহলে কারা জানতে পারেন?

আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা এই মায়া থেকে বিমুখ হয়ে আমারই শরণাগত হয়ে আমার ভজনা করেন, তাঁরা

আমার কৃপায় এই মায়া থেকে উত্তীর্ণ হন (আমাকে স্বরূপত জেনে নেন) ॥১৪॥

যদি তাই হয়, তাহলে সকলেই কেন আপনার শরণ গ্রহণ করেন না?

যাঁরা আসুরী ভাবের আশ্রয় নেন এবং যাঁদের বিবেক বা জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত, সেইরূপ নরাধম, পাপী, মূঢ় ব্যক্তিরা আমার শরণ গ্রহণ করেন না ॥১৫॥

আপনার শরণ তাহলে কারা গ্রহণ করেন, ভগবান?

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জুন! অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী (প্রেমিক)—এই চারপ্রকার সুকৃতিশালী ভক্ত আমার ভজনা করেন অর্থাৎ আমার শরণাগত হন ॥১৬॥

এই চারপ্রকার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে অনন্য ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ ; কারণ তিনি নিরন্তর আমাতেই আকৃষ্ট থাকেন। তাই আমি তাঁর এবং তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥১৭॥

তবে কি অন্য ভক্তরা শ্রেষ্ঠ নয়?

তাঁরা সকলেই মহান ও শ্রেষ্ঠ।

প্রেমিক ভক্তদের তাহলে বিশেষত্ব কি?

প্রেমিক ভক্তেরা আমার আত্মা-স্বরূপ—এই হল আমার অভিমত ; কারণ যার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনও গতি নেই, সেই আমাতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা আমাতেই দৃঢ়ভাবে আস্থা রাখেন। তাৎপর্য হল এই যে অর্থার্থীর অর্থের আকাঙ্ক্ষা থাকে, আর্তের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা থাকে, জিজ্ঞাসুর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা থাকে ; কিন্তু জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তের অন্য কোনও প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে না ॥১৮॥

জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তের এত মহিমা কেন?

বহু জন্মের পর অন্তিম এই মনুষ্যজন্মে আমার শরণাগত হয়ে 'সবকিছুই বাসুদেব'—এই জ্ঞান লাভ করেন, এরূপ জ্ঞানবান মহাত্মা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ ॥১৯॥

এরূপ প্রেমিক ভক্ত না হওয়ার কারণ কি?

নানারূপ কামনায় যাঁদের 'সবকিছুই বাসুদেব'—এই জ্ঞান আবৃত হয়েছে সেই নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে মানুষ আমার শরণাগত না হয়ে কামনা

পূরণের উদ্দেশ্যে নানা উপায় ও নিয়ম পালন করে অন্য দেবতার শরণাগত হন অর্থাৎ অন্য দেবতার উপাসনা করতে থাকেন ॥২০॥

আপনি কেন তাঁদের আপনার দিকে আকর্ষিত করেন না?

আমি মানুষকে প্রদত্ত স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিই না ; বরং যেসব মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক আমি তাঁদের শ্রদ্ধা সেইসব দেবতায় অচলা করে দিই এবং তাঁরা সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সকামভাবে সেই সেই দেবতার উপাসনা করেন। কিন্তু ভাই, আশ্চর্যের কথা হল এই যে তাঁরা উপাসনা করে যে ফল লাভ করেন, তা আমার বিধানেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু সকামভাবে উপাসনা করায় ঐসব অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বিনাশশীল ফলই প্রাপ্ত হন, আমাকে প্রাপ্ত হন না। দেবতাদের পূজকগণ তাঁদের পূজার সর্বাধিক ফল দেবলোক প্রাপ্ত করে পুনরাগমন প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে থাকেন ॥২১-২৩॥

আপনার ভক্তরা যখন আপনাকেই লাভ করেন, তাহলে সকলেই কেন আপনার ভক্ত হন না?

ভাই! অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী পরম ভাব না জেনে আমাকে (অব্যক্ত পরমাত্মাকে) জন্ম-মৃত্যু সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করে। অতএব তারা আর কীভাবে আমার ভক্ত হবে ॥২৪॥

তাঁরা আপনার পরম ভাব না জানতে পারলেও আপনি কেন এঁদের কাছে আপনার প্রকৃতরূপে প্রকটিত হন না?

না ভাই! এই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অজ এবং অবিনাশী বলে মনে করে না, সুতরাং যোগমায়ায় আবৃত হয়ে আমি ওঁদের সামনে নিজ প্রকৃত রূপ প্রকট করি না ॥২৫॥

তাহলে ঐ যোগমায়ার আচ্ছাদন আপনার সামনে কি থাকে না?

না অর্জুন, আমি অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সমস্ত প্রাণীকে জানি, কিন্তু এরা মায়ায় মোহগ্রস্ত থাকায় আমাকে জানতে পারে না ॥২৬॥

আপনাকে না জানার প্রধান কারণ কি?

হে ভরতর্ষভ! রাগ-দ্বেষ জাত দ্বন্দ্ব (মোহই) হল আমাকে না জানার প্রধান কারণ। হে পরন্তপ! এই দ্বন্দ্ব মোহে মোহিত হয়েই সকল প্রাণী জগতে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় ॥২৭॥

সকলেই কি এই দ্বন্দ্ব-মোহ দ্বারা মোহিত হয়ে থাকে?

না,যেসব পুণ্যকর্মা ব্যক্তির পাপ নাশ হয়েছে, তাঁরা দ্বন্দ্ব-মোহ অতিক্রম করে দৃঢ়ব্রতী হয়ে আমার ভজনা করেন ॥২৮॥

দৃঢ়ব্রতী হয়ে আপনার ভজনা করলে কি হয়?

যাঁরা জরা-মরণাদি দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমার শরণাগত হয়ে যত্নশীল হন, তাঁরা ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম এবং সকল কর্মতত্ত্ব অবগত হন। তাঁরা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞসহ আমাকে অর্থাৎ আমার সমগ্র রূপকে ('সমস্তই বাসুদেব'-এই রূপকে) জানতে পারেন। শুধু তাই নয়, এই অনন্য ভক্ত মৃত্যুকালে আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥২৯-৩০॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অষ্টম অধ্যায়

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম! এতক্ষণ আপনি আপনার আশ্রিতদের ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ইত্যাদি সমগ্র রূপ জানার কথা বলেছেন। আমি জানতে চাই এই ব্রহ্ম কি?

ভগবান বললেন—সেই পরম অক্ষর অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে ব্রহ্ম বলা হয়।

অধ্যাত্ম কাকে বলে?

জীবের অস্তিত্ব (স্ব-ভাব)-কেই অধ্যাত্ম বলা হয়।

কর্ম কি?

মহাপ্রলয়ে নিজ নিজ কর্মের সহিত আমাতে লীন হওয়া জীবগণকে মহাসর্গের শুরুতে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) কর্মফল ভোগ করার নিমিত্ত আমার নিজের মধ্য থেকে প্রকটিত করা অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করাকেই ত্যাগরূপ কর্ম বলা হয়।

ভগবান, অধিভূত কাকে বলে?

হে নরশ্রেষ্ঠ! যেসব পদার্থ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তা সবই অধিভূত।

অধিদৈব কাকে বলা হয়?

সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হন যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, তিনিই হলেন অধিদৈব।

এই দেহে অধিযজ্ঞ কে?

মনুষ্যদেহে অন্তর্যামীরূপে আমিই অধিযজ্ঞ।

হে মধুসূদন! বশীভূত চিত্তের মানুষেরা মৃত্যুকালে কীভাবে আপনাকে জানতে পারেন?

হে অর্জুন! আমি প্রথমে মৃত্যুর সময়ের কিছু নিয়মের কথা জানাচ্ছি। যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি যে আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনও সন্দেহ নেই। ॥১-৫॥

মৃত্যুর সময়ে আপনাকে স্মরণ করলে আপনাকে প্রাপ্ত হবেন, কিন্তু যদি আপনাকে স্মরণ না করেন, তাহলে?

হে কৌন্তেয়, (মানুষ মৃত্যুর সময় যেমন যেমন ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন) তিনি সেইভাবে সর্বদা তন্ময় থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন ॥৬॥

তাহলে মৃত্যুর সময়ে আপনাকে স্মরণ করার জন্য কি করা উচিত?

তুমি মন ও বুদ্ধি আমাকে অর্পণ করে সর্বসময় আমাকেই স্মরণ কর এবং প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম কর।

তাতে কি হবে?

তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে ॥৭॥

আপনার কোন স্বরূপ চিন্তা করলে নিয়তাত্মা পুরুষ আপনাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, ভগবান?

সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার—এই তিনটি আমার স্বরূপ। সর্বপ্রথম আমার সগুণ-নিরাকারের চিন্তার সাহায্যে আমাকে পাওয়ার কথা জানাচ্ছি। হে পার্থ! যে ব্যক্তি অভ্যাসযোগের দ্বারা অনন্যচিত্তে পরম দিব্যপুরুষের অর্থাৎ আমার সগুণ-নিরাকার স্বরূপের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার সেই স্বরূপই প্রাপ্ত হন ॥৮॥

সেই স্বরূপ কেমন ভগবান?

তিনি সর্বজ্ঞ, আদিপুরুষ, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের ধারক-পোষক, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং অজ্ঞান অন্ধকারবর্জিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশক। যে

ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি এইভাবে স্বরূপ চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যুকালে যোগবলের সাহায্যে মনকে একাগ্র করে প্রাণকে ভ্রূ-মধ্যে স্থাপন করে দেহত্যাগ করলে সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥৯-১০॥

সগুণ-নিরাকার স্বরূপ চিন্তা দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত করার কথা আমি শুনলাম। এবার বলুন নিয়তাত্মা ব্যক্তিগণ নির্গুণ-নিরাকারের চিন্তার দ্বারা কীভাবে আপনাকে লাভ করেন?

বেদ-বিদ্‌গণ যাঁকে অক্ষর বলেন, রাগ-দ্বেষবর্জিত সাধুগণ যা প্রাপ্ত করেন এবং যাঁকে পাবার আশায় ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পরম পদ প্রাপ্তির উপায় তোমাকে আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি। যে সাধক মৃত্যুকালে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, মনকে হৃদয়ে স্থাপন করে, প্রাণকে মস্তকে ধারণ করেন ও যোগে স্থিত হয়ে, 'ওঁ'—এই ব্রহ্মাত্মক এক অক্ষর উচ্চারণ করে আমার নির্গুণ-নিরাকার স্বরূপ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন ॥১১-১৩॥

নির্গুণ-নিরাকার চিন্তার দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে কথা আমি শুনলাম। এখন বলুন সগুণ-সাকার চিন্তার সাহায্যে নিয়তাত্মা পুরুষ আপনাকে কীভাবে প্রাপ্ত হন?

হে পার্থ! অনন্যচিত্ত হয়ে যেসব ব্যক্তি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে থাকেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য অর্থাৎ সেই যোগী অতি সহজেই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥১৪॥

আপনাকে লাভ করলে কি হয়, ভগবান?

যে মহাত্মাগণ আমার প্রেমে লীন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁরা এই অনিত্য ও দুঃখের আলয় স্বরূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ॥১৫॥

পুনর্জন্ম তাহলে কাদের হয়?

হে অর্জুন! ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল তাই ঐসব লোকে গেলে আবার ফিরে আসতেই হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম নিতেই হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর জন্ম নিতে হয় না ॥১৬॥

এইসব লোক পুনরাবর্তী কেন?

কালের অবধি সম্পন্ন হওয়ার জন্য।

সেই কালের অবধি (সীমা) কি?

যেসব ব্যক্তি দিন ও রাতের তত্ত্ব জানেন, তাঁরা জানেন যে এক সহস্র

চতুর্যুগ* পার হলে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং এক সহস্র চতুর্যুগ পার হলে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিন আরম্ভের সময় (তিনি নিদ্রা থেকে উঠলে) ব্রহ্মার সূক্ষ্ম দেহ থেকে সমস্ত প্রাণী প্রকটিত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রি আরম্ভ হলে (তাঁর ঘুমানোর সময়) ব্রহ্মার সূক্ষ্মদেহে সমস্ত প্রাণী লীন হয়ে যায় ॥১৭-১৮॥

এইসব প্রাণীরা কেন বারংবার জন্মায় ও মরে?

এই প্রাণীগণ তো সব সেই একই, যা সৃষ্টির প্রারম্ভে থাকে। কিন্তু তারা নিজ নিজ রাগ-দ্বেষযুক্ত স্বভাবের পরবশ হয়ে বারংবার ব্রহ্মার জাগরণের সময় উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিকালে লীন হয়ে যায় ॥১৯॥

এই অব্যক্তের (ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরের) থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে আছেন, যাঁর কোনও বিনাশ নেই?

হ্যাঁ আছেন, ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ (অতীত), নিত্য বিরাজ ভাবরূপ অব্যক্ত (পরমাত্মা) আছেন, যিনি সকল প্রাণীর বিনাশ হলেও বিনষ্ট হন না, তাঁকেই অব্যক্ত, অক্ষর এবং পরম (শ্রেষ্ঠ) গতি বলা হয়, যাঁকে প্রাপ্ত হলে জীবকে আর জগতে ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হল আমার পরমধাম (স্বরূপ) ॥২০-২১॥

কী করে সেই পরমধামকে লাভ করা যায়?

হে পার্থ! সমস্ত জগৎ যাঁর অন্তর্গত এবং সমস্ত জগতে যিনি ব্যাপ্তস্বরূপে অবস্থিত, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে অনন্যভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় ॥২২॥

অন্যের অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কি হয়?

হে অর্জুন! যে মার্গে গেলে অন্যের (সংসারের) সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা প্রাণীগণ এই জগতে ফিরে আসেন না এবং যে মার্গে গেলে অপরের (সংসারের) সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রাণী ফিরে আসেন, সেই উভয় মার্গের (পথের) কথা আমি বলছি ॥২৩॥

---

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের আয়ুষ্কাল হল ক্রমশ চার লাখ বত্রিশ হাজার, আট লাখ চৌষট্টি হাজার, বার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার এবং সতের লাখ আটাশ হাজার বছর। এরূপে তেতাল্লিশ লাখ কুড়ি হাজার বছরে একটি চতুর্যুগ হয়।

এই মার্গ দুটি কি ভগবান?

যে মার্গে প্রকাশকরূপ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, এবং ছ'মাসের উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন, দেহ-ত্যাগ করে সেই মার্গে আগত ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আবার ফিরে আসেন না। আর যে মার্গে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং ছ'মাসের দক্ষিণায়ণের দেবতা থাকেন, দেহ-ত্যাগ করে সেই মার্গে আগত সকাম ব্যক্তিরা স্বর্গাদি উচ্চলোকের সুখভোগ করে আবার ফিরে আসেন ॥২৪-২৫॥

এই দুটি পথ কবে থেকে শুরু হয়েছে?

প্রাণীদের এই শুক্ল ও কৃষ্ণ মার্গ অনাদি। এর মধ্যে শুক্লমার্গে গমন করলে পুনর্জন্ম হয় না এবং কৃষ্ণমার্গে গমন করলে জন্মাতে হয় ॥২৬॥

যাতে ফিরে না আসতে হয়—তার জন্য কি করা উচিত, ভগবান?

হে পার্থ! উভয় মার্গের পরিণাম জেনে কোনও যোগী সংসারে মোহগ্রস্ত হন না। তাই হে অর্জুন! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও অর্থাৎ সংসারে সর্বদা নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হয়ে থাক ॥২৭॥

যোগী হলে কি হবে, ভগবান?

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যেসব পুণ্যফল কথিত আছে, যোগী সেইসব পুণ্যফল অতিক্রম করে আদিস্থান পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥২৮॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

নবম অধ্যায়

আমি মাঝখানে প্রশ্ন করায় আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। আমি প্রশ্ন করার আগে আপনি আরও কি বলতে চেয়েছিলেন, ভগবান?

ভগবান বললেন—ভাই! আমি প্রথমে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলছিলাম। সেই অত্যন্ত গুহ্য বিজ্ঞানসহ জ্ঞান দোষদৃষ্টিশূন্য আমি আবার বলছি, এটি জানলে তুমি জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ॥১॥

সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান তো তাহলে অত্যন্ত কঠিন?

না ভাই, এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গোপনীয় বিষয়ের রাজা, অতি পবিত্র, অতি উত্তম, প্রত্যক্ষ ফলদায়ী, ধর্মময়, অবিনাশী এবং খুবই সহজসাধ্য ॥২॥

এরূপ সহজসাধ্য বিদ্যা সকলেই কেন প্রাপ্ত করে না?

হে পরন্তপ! এই জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ ধর্মে মানুষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে না, তাই এরা আমাকে প্রাপ্ত না করে মৃত্যুরূপ সংসারে ফিরে যায় অর্থাৎ বারংবার জন্মাতে ও মরতে থাকে ॥৩॥

সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ ধর্ম (বিদ্যা) কেমন, ভগবান?

আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত প্রাণীতে বিদ্যমান এবং সমস্ত প্রাণী আমাতেই অবস্থিত। কিন্তু আমি সকল প্রাণীতে নেই এবং সকল প্রাণীও আমাতে নেই, অর্থাৎ প্রাণীদের পৃথক সত্তা বলে যদি মনে করা হয় তাহলে সেখানে সকল প্রাণীতে আমি বিদ্যমান এবং সব প্রাণীও আমাতে অবস্থিত। কিন্তু যেখানে প্রাণীদের পৃথক সত্তা মনে করা হয় না, সেখানে আমি প্রাণীদের মধ্যে নেই এবং প্রাণীরাও আমাতে নেই ; কিন্তু আমিই সবকিছু।

কিন্তু এই জগৎ সংসারের কোনও একজন উৎপাদক ও আধার তো আছেনই?

ভাই! সে তো আমিই ; কিন্তু এই সমস্ত প্রাণীর উৎপন্নকারী, সকলের ধারক, ভরণ-পোষণকারী হয়েও আমি এই প্রাণীদের মধ্যে অবস্থিত নই, এগুলির থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত—আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ্য) অনুধাবন কর ॥৪-৫॥

তাহলে এইসব প্রাণী কীভাবে আপনাতে অবস্থিত?

যেমন, সর্বত্র বিচরণশীল মহান বায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে, তেমনই সকল প্রাণী আমাতেই অবস্থান করে বলে জেনো ॥৬॥

তাহলে এই প্রাণীরা তো মুক্তিলাভ করে যায়?

না হে কৌন্তেয়, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এইসব প্রাণী মহাপ্রলয়ে আমার প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং সর্গের (সৃষ্টির) প্রারম্ভে আমি আবার তাদের উৎপন্ন করি ॥৭॥

আপনি কতদিন তাদের সৃষ্টি করে থাকেন?

যতদিন পর্যন্ত তারা প্রকৃতির (স্বভাবের) পরবশ হয়ে থাকে, ততদিন আমি নিজ প্রকৃতিকে বশ করে তাদের বারংবার সৃষ্টি করে থাকি ॥৮॥

আপনি যখন তাদের বারংবার সৃষ্টি করেন, তখন আপনার এই সৃষ্টিরূপ কর্মের সঙ্গে তো সম্পর্ক থাকে, ভগবান?

না ধনঞ্জয়, আমি ঐ কর্মে আসক্তিবর্জিত ও উদাসীনের ন্যায় সদা নির্লিপ্ত থাকি, তাই এই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না ॥৯॥

তাহলে আপনি কী করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন?

প্রকৃতপক্ষে আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি আমার সত্তা ও স্ফূর্তি থেকেই এই সমস্ত চর-অচর প্রাণী সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতার জন্যই জগতে নানাবিধ পরিবর্তন হয়ে চলেছে ॥১০॥

আপনার শক্তি থেকেই যখন জগতে সবকিছু হয়, তখন সকলেই কেন আপনার ওপর শ্রদ্ধা রাখেন না?

মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে সমস্ত প্রাণীর মহেশ্বররূপ পরম ভাব না জেনে, সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে থাকে ॥১১॥

এই মূঢ় ব্যক্তিরা কেমন হয়, ভগবান?

এই মূঢ় ব্যক্তিরা আসুরী, রাক্ষসী, মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের সমস্ত আশা, শুভকর্ম ও জ্ঞান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অর্থাৎ সেগুলি সৎ-ফল প্রদান করে না ॥১২॥

তাহলে কারা আপনাকে শ্রদ্ধা করেন, ভগবান?

হে পার্থ! যেসব মহাত্মা আমাকে সমস্ত প্রাণীর আদি ও অবিনাশী বলে মনে করেন, তাঁরা আমার দৈবী-সম্পদের সহায়তায় অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে থাকেন ॥১৩॥

যাঁরা আপনার ভজনা করেন, তাঁদের লক্ষণ কি?

আমাতে নিত্যযুক্ত এই দৃঢ়ব্রতী ব্যক্তিগণ ভক্তি সহকারে আমার নামকীর্তন করেন এবং আমাকে প্রাপ্তির জন্য তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করেন ও আমাকে নমস্কারপূর্বক আমার উপাসনা করে থাকেন ॥১৪॥

আপনার উপাসকরা কি আরও অনেক প্রকারের হন, ভগবান?

হ্যাঁ, কিছু সাধক জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অভিন্নভাবে আমার পূজা দ্বারা আমাকে

উপাসনা করেন, অপর কিছু সাধক নিজেকে পৃথক ভেবে এবং বিশ্বকে আমার স্বরূপ মনে করে (সেব্য-সেবকরূপে) নানাভাবে আমার উপাসনা করেন ॥১৫॥

বিশ্বের উপাসনাতে কী করে আপনার উপাসনা হল, ভগবান?

আমিই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া। আমিই জানার উপযুক্ত বিধি-নিয়ম, পবিত্র ভাব, ওঁকার, ঋক্-সাম-যজুর্বেদ। এই সম্পূর্ণ বিশ্বজগতের পিতা, ধাতা, মাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, সুহৃদ্, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থান, নিধান ও অবিনাশী বীজও আমিই। হে অর্জুন! আমিই সূর্যরূপে তাপ প্রদান করে, বাষ্পরূপে জল গ্রহণ করি এবং আমিই সেই বাষ্পকে বৃষ্টি-রূপে বর্ষণ করি। আমিই অমৃত এবং মৃত্যু। আর কি বলব? সৎ অসৎ (জড় ও চেতন) ও আমিই ॥১৬-১৯॥

বিশ্বজগৎরূপে যখন সবই আপনি, তখন আপনাকে পূজা না করে মানুষ দেবতাদের উপাসনা করেন কেন?

সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ তিন বেদে কথিত যজ্ঞাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ কামনায় ইন্দ্রপূজা করে থাকেন। তারপর সোমরস পান করে স্বর্গের প্রতিবন্ধকরূপ পাপরহিত হয়ে এই ব্যক্তিরা তাঁদের পুণ্যের ফলে স্বর্গে গমন করেন। সেখানে দেবগণের দিব্য-ভোগ সকল ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় মর্তলোকে জন্ম নেন। এইভাবে তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণকারী এবং ভোগ পরবশ ব্যক্তিরা বারংবার জন্মাতে ও মরতে থাকেন ॥২০-২১॥

যাঁরা সকাম অনুষ্ঠানের আশ্রয় নেন, তাঁদের তো এরূপ দশা হয়, কিন্তু কেউ যদি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে?

যাঁরা অনন্যচিত্তে আমার চিন্তা করতে করতে আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেইসব ভক্তের যোগক্ষেম স্বয়ং আমি বহন করে থাকি, অর্থাৎ অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করাই এবং যা প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলিকে স্বয়ং রক্ষা করি ॥২২॥

কিন্তু আপনার উপাসনা না করে যদি কেউ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাহলে?

হে কৌন্তেয়! যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার পূজা (উপাসনা)

করেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে ('সৎ-অসৎ সবকিছু আমিই'—এই দৃষ্টিতে) আমাকেই পূজা করে থাকেন কিন্তু তাঁদের সেই পূজা বিধিপূর্বক হয় না ॥২৩॥

ভগবান, সেই পূজাও যখন আপনাকেই করা হয়, তখন তা কেন অবিধিপূর্বক হয়?

যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি সমস্ত শুভকর্মের ভোক্তা এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতের অধিকর্তা আমিই, কিন্তু তাঁরা আমাকে এইভাবে তত্ত্বত জানেন না। তাই তাঁদের পতন হয় ॥২৪॥

তাঁদের কী রকম পতন হয়?

দেবগণের ভক্তগণ দেবলোক, পিতৃপুরুষের ভক্তগণ পিতৃলোক এবং ভূত-প্রেতাদির ভক্তগণ প্রেতলোক প্রাপ্ত হন ; আর যাঁরা আমার ভক্ত তাঁরা আমাকেই লাভ করেন ॥২৫॥

যে ভক্তির দ্বারা আপনার ভক্তগণ আপনাকেই লাভ করে থাকেন, সেই ভক্তি তাহলে খুবই কঠিন?

না ভাই, তা খুবই সহজ। যে ভক্ত প্রেমের সঙ্গে আমাকে পত্র-পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি অর্পণ করেন, আমাতে তল্লীন সেই ভক্তের ভক্তিপূর্বক অর্পিত দ্রব্যাদি আমি নিজেই গ্রহণ করি ॥২৬॥

আমার কী করা উচিত?

হে কৌন্তেয়! তুমি যা কিছু খাও, যে যজ্ঞ কর, যা দান কর, তপস্যা কর এবং তাছাড়াও যা যা করে থাক, তা সবই আমাকে অর্পণ কর ॥২৭॥

অর্পণ করলে কী হবে, ভগবান?

ভাই, তুমি বন্ধনকারী সমস্ত শুভ-অশুভ কর্মের ফলমুক্ত হয়ে আমাকেই লাভ করবে ॥২৮॥

যিনি আপনাকে সমস্ত অর্পণ করে দেন, তাকে আপনি বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, আর যিনি আপনাকে সমস্ত অর্পণ করেন না, তিনি বন্ধনের মধ্যেই থাকেন। আপনার এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

না ভাই, এ পক্ষপাতিত্ব নয়! আমি তো সকল প্রাণীতেই সমান। কেউই আমার দ্বেষ্য নয়, প্রিয়ও কেউ নয়। কিন্তু যাঁরা প্রেম-ভক্তি সহকারে আমার ভজন-উপাসনা করেন, তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে বিরাজ করি ॥২৯॥

কেউ যদি দুরাচারী হন, তাহলে তিনি কি আপনার ভজনা করতে পারেন? আপনার ভক্ত হতে পারেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন। যদি অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও অন্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করে আমার ভজনা করেন, তাহলে তাঁকে সাধু বলেই গণ্য করা উচিত ; কেননা তাঁর সঙ্কল্প অতি শুভ ॥৩০॥

তাকে শুধু সাধু বলেই মানা হবে?

না, তিনি তখনই ধর্মাত্মা (মহা-পবিত্র) হয়ে যান এবং চিরশান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা করতে পার যে আমার ভক্তের কখনও পতন হয় না ॥৩১॥

আর কেউ কি আপনার ভক্তির অধিকারী হতে পারেন?

হে পার্থ! যারা পাপযোনিসম্ভূত এবং স্ত্রীগণ, বৈশ্য, শূদ্ররাও আমার আশ্রয় নিয়ে আমাকে লাভ করেন। আর যাঁরা জন্ম ও কর্মে পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, তাঁরা যে আমার ভক্তি লাভ করবেন এতে আর বলার কি আছে!

আমি কী করে সেরূপ ভক্ত হব, ভগবান?

এই বিনাশশীল এবং সুখবর্জিত শরীর প্রাপ্ত করে তুমি কেবল আমারই ভজনা কর ॥৩২-৩৩॥

কী করে আপনার ভজনা করব?

তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, আমাকেই পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে আমার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে আমার পরায়ণ হলে, তুমি আমাকেই লাভ করবে ॥৩৪॥

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

দশম অধ্যায়

ভগবান বললেন—ভাই! তুমি এখন আমার পরম বাক্য * শোন, তোমার মঙ্গলার্থেই আমি তা বলব। কারণ হে মহাবাহো! তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস।

ভগবান, সেই পরম বাক্য কী?

এই সমগ্র জগৎ আমা হতেই প্রকটিত, একথা সম্পূর্ণভাবে দেবতারাও জানেন না মহর্ষিরাও জানেন না, কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি-পুরুষ ॥১-২॥

দেবতা এবং মহর্ষিগণ যখন আপনাকে সবকিছুর মূল বলে জানেন না, তাহলে মানুষ তা কি প্রকারে জানবে এবং তার কল্যাণই বা হবে কিভাবে?

যে ব্যক্তি আমাকে অজ, অবিনাশী এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেন, মানুষের মধ্যে তিনিই মোহশূন্য ও জ্ঞানী এবং তিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত হন ॥৩॥

আপনার পরম বাক্য আমি কী করে বুঝব, ভগবান?

বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহরহিত হওয়া, ক্ষমা, সত্য, সংযত ইন্দ্রিয় থাকা, মনকে বশীভূত করা, সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হওয়া, লীন হওয়া, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও অপযশ—প্রাণীর এই বহুবিধ পৃথক পৃথক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়। শুধু এই ভাবগুলিই নয়, যাঁরা আমার ওপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখেন এবং সম্পূর্ণ জগৎ যাঁদের প্রজা—সেই সপ্ত মহর্ষি এবং তাঁদেরও পূর্বের চার সনকাদি ও চতুর্দশ মনুও আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন অর্থাৎ এঁদের সকলেরই উৎপাদক এবং শিক্ষক আমিই ॥৪-৬॥

---

* সবকিছুর মূলেই যে তিনি, এটি জানানোই ভগবানের পরম বাক্য।

বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি এবং মহর্ষি ইত্যাদি আমা হতেই উৎপন্ন—আপনার এই কথাটির তাৎপর্য কী?

যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগ* শ্রদ্ধার সঙ্গে দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেন, তাঁর যে আমাতে অবিচলিত ভক্তি হয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই ॥৭॥

সেই দৃঢ়ভাবে মানা ব্যাপারটা কী?

আমি জগৎ-সংসারের মূল কারণ এবং আমা হতেই সমস্ত জগৎ ক্রিয়াশীল হয়—এইভাবে আমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে আমাতেই শ্রদ্ধাভক্তি রেখে বুদ্ধিমান ভক্তেরা আমার ভজনা করেন ॥৮॥

ভগবান, তাঁদের সেই উপাসনা কেমন?

যাঁদের মন ও প্রাণ আমাতেই সমর্পিত সেই ভক্তগণ পরস্পর আমার গুণ-প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও কীর্তন করে সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাকেই প্রেম ও ভক্তি করেন ॥৯॥

আপনি এরূপ ভক্তদের জন্য কী করেন?

এরূপ সদা মদ্‌গতচিত্ত এবং প্রেমপূর্বক আমার উপাসনাকারী ভক্তদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ (সমত্ব) প্রদান করি যাতে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥১০॥

এ ছাড়া আপনি আর কী করেন?

সেই ভক্তদের কৃপা করে তাঁদের স্বরূপে অবস্থিত আমি তাঁদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে জ্ঞানের আলোকের সাহায্যে সর্বতোভাবে নাশ করি ॥১১॥

অর্জুন বললেন—আহা! হে ভগবান ভক্তদের ওপর আপনার এই অলৌকিক, বিশেষ কৃপার কথা শুনে আমি অভিভূত হচ্ছি। হে প্রভো! নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম, পরম স্থান, মহাপবিত্র সবই আপনি। আপনি নিত্য, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং ব্যাপ্তিস্বরূপ—সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত,

---

* ভগবানের সামর্থ্যকে বলা হয় 'যোগ' এবং এই যোগ থেকে যে ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়, তাকে বলা হয় 'বিভূতি'।

দেবল এবং ব্যাস একথা বলেন এবং স্বয়ং আপনিও আমাকে তাই বলছেন ॥১২-১৩॥

হে অর্জুন! আমি যা বলি, তার ওপর কি তোমার বিশ্বাস আছে?

হ্যাঁ কেশব, আপনি আমাকে যা কিছু বলছেন, তা সবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! আপনার প্রকটিত হওয়ার তাৎপর্য দিব্যশক্তিসম্পন্ন দেবতারাও জানেন না এবং বিশেষ মায়াশক্তিধর দানবরাও জানে না ॥১৪॥

দেবগণও জানেন না, তাহলে কে জানেন?

হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব। হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! আপনি স্বয়ংই আপনাকে জানেন। তাই আপনি যে বিভূতির সাহায্যে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন, সেইসব দিব্য বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে আপনিই একমাত্র সমর্থ ॥১৫-১৬॥

বিভূতিগুলি শুনে কী করবে?

হে যোগিন্! সর্বদা সম্পূর্ণরূপে চিন্তা রত থেকে আমি কিভাবে আপনাকে জানতে পারব? এবং হে ভগবান! কোন কোন ভাবরূপে আমি আপনার চিন্তা করব? তাই হে জনার্দন ! আপনি আপনার বিভূতি এবং যোগসমূহ আবার বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন ; কেননা আপনার অমৃতোপম বাক্য শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না ॥১৭-১৮॥

ভগবান বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আমার দিব্য বিভূতিসমূহ তোমাকে সংক্ষেপে বলছি ; কেননা, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতি বিস্তারের কোনও শেষ নেই ॥১৯॥

আপনার এইসকল দিব্য বিভূতি কিরূপ, ভগবান?

হে গুড়াকেশ ! সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই অবস্থিত এবং প্রাণীদের অন্তঃকরণে আত্মরূপে আমিই অবস্থান করি। অদিতির পুত্রদের মধ্যে বিষ্ণু (বামন) এবং প্রকাশমান জ্যোতিষ্কের মধ্যে কিরণমালী সূর্য আমিই। মরুতের তেজ এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্রও আমি। বেদসমূহে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে মন এবং প্রাণীগণের চেতনা (প্রাণশক্তি)ও আমি। রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরু আমি। হে পার্থ! পুরোহিত-

গণের প্রধান বৃহস্পতিকে আমারই স্বরূপ বলে জেনো।

আপনার আর কী কী বিভূতি আছে?

সেনাপতিদের মধ্যে স্কন্দ (কার্তিক) এবং জলাশয়সমূহে সমুদ্র আমিই। মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দাদিতে আমি এক অক্ষর প্রণব, সমস্ত যজ্ঞাদির মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়। সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে কপিলমুনিও আমি। অশ্বসমূহের মধ্যে অমৃতের সঙ্গে সমুদ্র হতে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়া এবং শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে ঐরাবত ও মানুষদের মধ্যে রাজাকে আমার বিভূতি বলে জানবে ॥২০-২৭॥

আর কোনগুলিকে আপনার বিভূতি বলে মানব?

অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুগুলির মধ্যে কামধেনু আমিই। ধর্মের আনুকূল্যে সন্তান উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি এবং সর্পাদিতে আমি বাসুকি। নাগেদের মধ্যে শেষনাগ, জল-জন্তুদের অধিপতি বরুণ, পিতৃকুলে অর্যমা এবং শাসনকর্তা যমও আমি। দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে কাল, পশুদের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়ও আমি। পবিত্রকারীর মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, জলজন্তুদের মধ্যে কুমীর এবং স্রোতস্বিনীর মধ্যে গঙ্গাও আমি ॥২৮-৩১॥

আপনি আর কী কী পদার্থে আছেন?

হে অর্জুন! সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই অবস্থান করি। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং শাস্ত্রার্থ আলোচনাকারীদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী 'বাদ' আমিই। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাসগুলির মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস। আমিই অক্ষয়কাল অর্থাৎ কালেরও মহাকাল এবং সকল দিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা (বিধাতা)ও আমি ॥৩২-৩৩॥

আপনি আর কোন কোন রূপে আছেন?

সকলকে হরণকারী মৃত্যু এবং যারা উৎপন্ন হয় তাদের উৎপত্তির হেতুও আমি। নারীজাতির কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমাও আমি। গীত হওয়া শ্রুতির মধ্যে বৃহৎসাম এবং বৈদিক ছন্দের গায়ত্রী ছন্দও আমি। দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং ঋতুগুলির মধ্যে বসন্ত ঋতু

আমি। আমি ছলনাকারীদের দ্যূতক্রীড়া এবং তেজস্বীগণের তেজ। বিজয়ী ব্যক্তিদের জয়, উদ্যোগকারীদের উদ্যম ও সাত্ত্বিক পুরুষদের সাত্ত্বিক ভাবও আমি ॥৩৪-৩৬॥

আপনার আর কী কী স্বরূপ ভগবান?

বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্থাৎ তুমি), মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস, কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য আমি। আমি দমনকারীদের দণ্ড, বিজয় লাভে ইচ্ছুকদের নীতি, গুহ্য ভাবে মৌন এবং জ্ঞানবানদের জ্ঞান। আর কী বলব! সমস্ত প্রাণীর বীজ (কারণ) আমিই ; কারণ হে অর্জুন! আমি ছাড়া চর-অচর কোনও প্রাণীই নেই অর্থাৎ চর-অচর সবকিছু আমিই ॥৩৭-৩৯॥

আপনি কি আপনার সমস্ত বিভূতিই ব্যক্ত করেছেন?

না পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতির কোনও অন্ত নেই। তোমার কাছে আমি যে বিভূতির বিস্তার করলাম তা শুধু সংক্ষিপ্ত আকারেই করেছি, কারণ আমি আমার নিজের বিভূতিসমূহের কথা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারি না ॥৪০॥

তাহলে আপনার বিভূতিগুলির প্রকৃত পরিচয় কী ভগবান?

জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যময়, শোভাময়, বলযুক্ত বস্তু আছে, সেগুলিকে তুমি আমারই তেজের (যোগের) কোনও একটি অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। ভাই অর্জুন! সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার একাংশে মাত্র ব্যাপ্ত করে আমি তোমার সম্মুখে হাতে লাগাম ও চাবুক নিয়ে অবস্থান করছি, তোমার নির্দেশ পালন করছি। অতএব তোমার এতকিছু জানার প্রয়োজন কী? ॥৪১-৪২॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

একাদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন—হে ভগবান! আমার প্রতি কৃপা করার জন্য আপনি যে পরম গুহ্য আধ্যাত্মিক বিষয় (সবকিছুর মূলে আমি) বলেছেন, তাতে আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে। হে কমলনয়ন! আমি সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় আপনার কাছ থেকে শুনেছি এবং আপনার অবিনাশী মাহাত্ম্যগুলিও বিস্তারিতভাবে জেনেছি ॥১-২॥

তাহলে তুমি এখন কী চাও?

হে পুরুষোত্তম! আপনি আপনার বিষয় যেমন বললেন, প্রকৃতপক্ষে তা সেইরূপই। এখন হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার সেই পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখতে চাই, যার একাংশে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। কিন্তু হে প্রভো! আপনি যদি আমাকে আপনার সেই পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখার যোগ্য বলে মনে করেন তাহলে হে যোগেশ্বর! আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপ আপনি আমাকে দেখান ॥৩-৪॥

ভগবান বললেন—হে পার্থ! তুমি শুধু আমার একটি রূপই নয়, আমার শত সহস্র রূপ দর্শন কর, যা দিব্য এবং নানা প্রকার, নানা রঙ্গ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট ॥৫॥

ভগবান আর কী দেখব?

হে ভারত! তুমি আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুতগণকে দেখ। যা তুমি আগে কখনও দেখনি, এরূপ বহু আশ্চর্যজনক বস্তু দর্শন কর ॥৬॥

কোথায় দেখব আমি?

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন! আমার দেহের একাংশে অবস্থিত চরাচরসহ সমস্ত জগৎকে তুমি অবলোকন কর। এ ছাড়া তুমি যদি আরও কিছু দেখতে

চাও, তাও তুমি দেখ * ॥৭॥

আপনি যে বারংবার আমাকে দেখতে বলছেন, কিন্তু আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কী উপায়ে দেখব?

ভাই, তুমি তোমার এই চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখতে পাবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি,তাই দিয়ে তুমি আমার এই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সামর্থ্য দর্শন কর ॥৮॥

এরূপ বলে ভগবান কী করলেন, সঞ্জয় ?

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! এই কথা বলে মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বর্যময় রূপ প্রদর্শন করলেন ॥৯॥

কী প্রকার রূপ দেখালেন ?

যাঁর অনেকগুলি মুখ এবং চক্ষু, নানা প্রকার অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য অলঙ্কার এবং যিনি তাঁর হাতে অনেক রকম দিব্য অস্ত্র ধরে আছেন, যিনি অনেক দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করে আছেন, চন্দন চর্চিত দেহ, এরূপ সর্বাশ্চর্যময় ও সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট তাঁর অনন্তরূপ প্রদর্শন করলেন ॥১০-১১॥

সঞ্জয়, কেন সেইরূপ আশ্চর্যময়?

আকাশে যদি সহস্র সূর্য একসঙ্গে উদিত হয়, তাহলে সেইসব প্রকাশ একসঙ্গে হয়েও এই বিশ্বরূপের দীপ্তির সমকক্ষ হতে পারে না ॥১২॥

এই রূপ অর্জুন কোথায় দর্শন করলেন?

অর্জুন দেবাদিদেব ভগবানের দেহের একাংশে সমস্ত জগৎ নানা বিভাগসহ দর্শন করলেন ॥১৩॥

অর্জুন সেই রূপ দর্শন করে কী করলেন, সঞ্জয়?

ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হলেন। তিনি হাতজোড় করে অবনত মস্তকে বিশ্বরূপ ভগবানকে প্রণাম করে স্তুতি করতে লাগলেন ॥১৪॥

---

* অর্জুন আর কী দেখতে চেয়েছিলেন? অর্জুনের মনে সন্দেহ ছিল যে যুদ্ধে তাঁদের জয় হবে, না কৌরবদের? (গীতা ২/৬)। তাই ভগবান বলেছেন যে তা-ও তুমি আমার দেহের একাংশে দেখে নাও।

অর্জুন কী বললেন, সঞ্জয়?

অর্জুন বললেন—হে দেব! আমি আপনার দেহে সমস্ত দেবতাদের, বিশেষ বিশেষ প্রাণীসমুদায়, কমলাসনে উপবিষ্ট শ্রীব্রহ্মা, কৈলাশে বিরাজমান শ্রীশঙ্কর, সমস্ত ঋষি এবং দিব্য সর্পাদি দেখতে পাচ্ছি ॥১৫॥

হে বিশ্বরূপ! হে বিশ্বেশ্বর! আমি আপনাকে অনেক হাত, পেট, মুখ ও নেত্রযুক্ত ও সর্বদিকে অনন্ত রূপবিশিষ্ট দেখছি। আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখছি না। আমি আপনার মস্তকে মুকুট, হস্তে গদা, চক্র, (শঙ্খ ও পদ্ম) ধারণ করা তেজোন্বিত, দেদীপ্যমান অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত চক্ষুর দ্বারা দর্শনে কষ্টসাধ্য এবং সর্বদিকে অপ্রমেয় স্বরূপ দেখছি ॥১৬-১৭॥

হে নাথ! আপনিই জানার উপযুক্ত পরম অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি এই বিশ্বের পরম আধার এবং আপনিই সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা আদিপুরুষ—আমি তাই মনে করি ॥১৮॥

তুমি কি কেবল মানই, নাকি দেখতেও পাচ্ছ, অর্জুন?

আমি আপনাকে আদি-মধ্য-অন্তবর্জিত, অনন্ত প্রভাবশালী, অসংখ্য বাহু সম্বলিত, চন্দ্র-সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এবং নিজের তেজের দ্বারা বিশ্বকে সন্তাপিত কর্মরত দেখছি ॥১৯॥

হে মহাত্মন্ ! স্বর্গ-মর্তের মধ্যবর্তী এই বিভাগ এবং দশদিক আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ! আপনার এই অদ্ভুত এবং উগ্ররূপ দেখে ত্রিলোক ব্যথিত হচ্ছে। আহা! সেইসকল দেবতা (যাঁদের আমি আগে স্বর্গে দেখেছিলাম) আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভীত হয়ে হাতজোড় করে আপনার নাম ও গুণ কীর্তন করছেন। মহর্ষি এবং সিদ্ধদের সমুদায় 'কল্যাণ হোক।' 'মঙ্গল হোক' ! ইত্যাদি বাক্যের সাহায্যে উত্তম স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তব করছেন ॥২০-২১॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য নামক দেবতাগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণ সকলেই আশ্চর্য চকিত হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন ॥২২॥

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট বহু বাহু, উরু, পদ, উদরবিশিষ্ট এবং বৃহৎ দন্তসম্বলিত ভয়ানক রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ভীতসন্ত্রস্ত হচ্ছে, আমি নিজেও ভীত হচ্ছি ॥২৩॥

হে বিষ্ণো, নানা বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট আকাশ স্পর্শকারী, বিস্ফারিত বদন ও জ্বলন্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট আপনার দেদীপ্যমান রূপ দর্শন করে অন্তরে ভীত হয়ে আমি ধৈর্য ও শান্তিলাভ করছি না। আপনার প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর দন্তসম্বলিত মুখ দর্শন করে আমি দিশা হারিয়েছি এবং শান্তি পাচ্ছি না। তাই হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হোন ॥২৪-২৫॥

আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণ সহ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও আপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। রাজন্যবর্গের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের এইসব পুত্রও আপনার ভয়ঙ্করদর্শন করাল মুখে বেগে প্রবেশ করছেন। তাঁদের কারও মস্তক চূর্ণ হয়ে আপনার দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে দেখা যাচ্ছে ॥২৬-২৭॥

যেমন নদীর জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে যায়, তেমনই মনুষ্য-লোকের ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহাবীরগণ আপনার জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন। যেমন, পতঙ্গ মোহবশত নিজের নাশের জন্য অত্যন্ত বেগে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই দুর্যোধনাদি ব্যক্তিরা নিজেদের নাশের জন্য অতিবেগে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হচ্ছেন এবং আপনিও জ্বলন্ত মুখে সকলকে গ্রাস করে চারদিক লেহন করছেন। হে বিষ্ণো! আপনার সেই উগ্র প্রকাশিত তেজে সমস্ত বিশ্ব সন্তপ্ত হচ্ছে ॥২৮-৩০॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রসন্ন হন। আদিরূপ আপনাকে আমি স্বরূপত জানতে চাই। হে উগ্ররূপ, আপনি বলুন আপনি কে?

ভগবান বললেন—আমি সকল লোককে নাশকারী বর্ধিত কাল।

আপনি এখানে কেন এসেছেন, ভগবান?

এখন আমি এইসকল মানুষকে সংহার করার জন্য এখানে এসেছি।

এখানে আপনার হাত থেকে কি কেউই রক্ষা পাবে না?

তোমার বিপক্ষে যেসব যোদ্ধাগণ উপস্থিত, তুমি যুদ্ধ না করলেও তাঁরা (বেঁচে) থাকবেন না। এঁদের আমি আগেই মেরে রেখেছি। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশ প্রাপ্ত কর এবং শত্রু জয় করে ধন-ধান্যসম্পন্ন রাজ্য লাভ কর।

আমার তাহলে যুদ্ধ করার কী প্রয়োজন?

হে সব্যসাচিন্। তুমি শুধুমাত্র নিমিত্ত হও ॥৩১-৩৩॥

কিন্তু মহারাজ ! ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ইত্যাদি যোদ্ধাদের কী করে জয় করব?

ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং আরও যেসব যোদ্ধা আছেন, তাঁদের সকলকেই আমি আগেই হত্যা করেছি। আমি যেসব শূরবীরকে হত্যা করেছি, তুমি তাদেরই মার। অতএব তুমি ভীত না হয়ে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে তুমি সব শত্রুকে জয় করবে ॥৩৪॥

তারপরে কী হল, সঞ্জয়?

সঞ্জয় বললেন—ভগবান কেশবের এই কথা শুনে ভীত কম্পিত অর্জুন হাতজোড় করে নমস্কার করলেন এবং পুনরায় অতিশয় ভীত হয়ে প্রণাম করে গদগদ কণ্ঠে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন ॥৩৫॥

অর্জুন বললেন—হে অন্তর্যামী ভগবান! আপনার নাম-গুণাদি কীর্তন করায় সম্পূর্ণ বিশ্ব হর্যান্বিত হচ্ছে এবং অনুরাগ লাভ করছে । আপনার নাম-গুণাদির কীর্তনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পালাচ্ছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার করছেন। এমন হওয়াই উচিত কার্য ॥৩৬॥

এরকম কেন উচিত, অর্জুন?

কারণ আপনি অনন্ত, সমস্ত দেবতার অধিকর্তা এবং জগতের আধার। আপনি অক্ষর ব্রহ্ম। সৎ এবং অসৎ উভয়ই আপনি এবং সৎ-অসৎ এর অতীত যা, তা-ও আপনি। হে মহাত্মন্! আপনি গুরুর গুরু, ব্রহ্মাকেও আপনি সৃষ্টি করেছেন—এমন যে আপনি তাঁকে সিদ্ধগণ কেন নমস্কার করবেন না? ॥৩৭॥

আপনিই আদিদেব এবং পুরাণ-পুরুষ। আপনি এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনিই সকলকে জানেন এবং সকলের জানার যোগ্য। আপনি সকলের পরম গন্তব্যস্থল। হে অনন্তরূপ! আপনাতেই সমস্ত বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত ॥৩৮॥

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। অতএব আপনাকে সহস্র নমস্কার! এবং বারবার আপনাকে নমস্কার করি! হে সর্ব! আপনাকে সামনে থেকে নমস্কার করি! পিছন থেকে নমস্কার করি! সর্বদিক দিয়েই নমস্কার করি! হে অনন্তবীর্য! আপনি অমিত

বিক্রমশালী। আপনি সমস্ত বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন। সুতরাং আপনিই সবকিছু ॥৩৯-৪০॥

হে ভগবান! আপনার এই মহিমা এবং স্বরূপ না জেনে আমি আপনাকে সখা বলে মনে করে ভুলবশত বা প্রেমবশত (না ভেবে-চিন্তে) 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে' এইরূপ যা কিছু বলেছি ; এবং হে অচ্যুৎ! চলতে ফিরতে, শয়নে-জাগরণে, ওঠা-বসায়, খাওয়া-দাওয়ার সময়ে একাকী বা ঐসব সখা, আত্মীয় প্রমুখদের সামনে আমি হাসি-ঠাট্টা করে যে কথা বলেছি, তার জন্য আমি অপ্রমেয়স্বরূপ আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ॥৪১-৪২॥

আপনি এই বিশ্ব চরাচরের পিতা, আপনি পূজনীয় এবং গুরুদেরও মহাগুরু! হে অসীম প্রভাবশালী ভগবান! ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই আপনার থেকে অধিক আর কে হবে ! তাই দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করার যোগ্য আপনাকে (ঈশ্বরকে) আমি প্রণাম করে, স্তবস্তুতি করে প্রসন্ন করতে চাই। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন পত্নীর অপরাধ সহ্য করেন, তেমনই হে দেব! আপনি আমার করা অপরাধগুলি ক্ষমা করুন ॥৪৩-৪৪॥

ঠিক আছে, ভাই ! তুমি এখন কী চাও?

আপনার এই অপূর্ব রূপ দেখে আমি হর্ষান্বিত হয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভয়ও পেয়েছি। অতএব হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হোন এবং আপনার পূর্বের দেবরূপে (বিষ্ণুরূপে) দর্শন দিন ; যেখানে আপনি মাথায় মুকুট ও হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে আছেন। আমি এখন আপনার সেই রূপ দেখতে চাই। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্তে! আপনি সেই চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হন ॥৪৫-৪৬॥

ভগবান বললেন—হে অর্জুন! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজের সামর্থ্যে তোমাকে এই অতি শ্রেষ্ঠ, তেজোময়, সকলের আদি ও অনন্ত বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। যা তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি ॥৪৭॥

মানুষ কীরূপ সাধন করলে আপনার এই বিশ্বরূপ দেখতে সক্ষম হয়, ভগবান?

কোনও সাধনার দ্বারাই নয়। হে কুরুপ্রবীর! ইহলোকে তোমার মত

কৃপাপাত্র ব্যতিরেকে কেউই বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, উগ্র তপস্যা এবং বড় বড় ক্রিয়া করলেও এইরকম রূপ দেখতে সক্ষম নয় ॥৪৮॥

কিন্তু ভগবান! এখন আমি আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমি কী করব?

ভাই! আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয় আর তোমার মধ্যে বিমূঢ়ভাবও যেন না আসে। এবার তুমি ভয় বর্জন করে প্রসন্ন চিত্তে আমার সেই রূপ পুনরায় দর্শন কর ॥৪৯॥

সঞ্জয়, এই কথা বলে ভগবান অর্জুনকে কোনরূপ দেখালেন?

সঞ্জয় বললেন—এই কথা বলে ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন। পুনরায় তিনি সৌম্য দ্বিভুজ রূপ ধারণ করে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন ॥৫০॥

অর্জুন, এখন তোমার ভয় দূর হয়েছে তো?

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! আপনার এই সৌম্য মনুষ্য-রূপ দেখে এখন আমার হৃদয় শান্ত হল এবং স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে পেলাম ॥৫১॥

ভগবান বললেন—তুমি আমার যে চতুর্ভুজরূপ দর্শন করলে, তা-ও অত্যন্ত দুর্লভ। দেবতারাও এই রূপ দেখার জন্য লালায়িত থাকেন। তুমি আমাকে যেমন দেখলে, সেই রূপ বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারাও দেখা সম্ভব নয় ॥৫২-৫৩॥

তাহলে আপনাকে কী করে দেখা সম্ভব?

হে শত্রুতাপন ! এই চতুর্ভুজ সম্বলিত রূপ অনন্যভক্তির সাহায্যেই দেখা সম্ভব। শুধু দেখাই নয়, স্বরূপত আমাকে জানাও সম্ভব এবং প্রাপ্ত করাও সম্ভব হয় ॥৫৪॥

সেই অনন্যভক্তি কীরূপে হয়, ভগবান?

হে পাণ্ডব! যা কিছু কর্ম করবে, তা আমার জন্যই কর, আমার পরায়ণ হও, আমার ভক্ত হও, আসক্তিবর্জিত হও এবং কোনও প্রাণীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না—এরূপ ভক্তিযুক্ত ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৫৫॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন—আপনি এখনই বলেছেন যে কেউ কেউ নিরন্তর আপনাতে নিবিষ্ট-চিত্ত হয়ে আপনার (সগুণ-সাকার রূপের) উপাসনা করেন আবার কেউ কেউ আপনার অক্ষর অব্যক্ত রূপের (নির্গুণ-নিরাকার রূপের) উপাসনা করেন। এই দু' প্রকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ॥১॥

ভগবান বললেন—আমাতে সতত মন নিবিষ্ট করে নিত্য পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে ভক্ত আমার উপাসনা করেন, তাঁকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক বলে মনে করি ॥২॥

কিন্তু যাঁরা আপনার অব্যক্ত রূপের উপাসনা করেন, তাঁদের?

সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং প্রাণীমাত্রের হিতে রত যেসব ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করে সর্বত্র পরিপূর্ণ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, অনির্দেশ্য, ধ্রুব, অক্ষর ও অব্যক্তের উপাসনা করেন, তাঁরাও আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৩-৪॥

তাহলে আপনাকে যাঁরা ভক্তি করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ হলেন কী করে, ভগবান?

অব্যক্তে আসক্ত-চিত্ত সেসব ব্যক্তি অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁদের নিজ সাধনে অনেক কষ্ট পেতে হয় কেননা দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত প্রাপ্তি অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু যাঁরা সকল কর্ম আমাতে অর্পণ করে আমার পরায়ণ হন এবং অনন্যভাবে আমারই ধ্যান দ্বারা আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ আমাতে আসক্ত-চিত্ত সেই ভক্তদের আমি অতি শীঘ্রই এই মৃত্যুরূপ সংসার থেকে উদ্ধার করি ॥৫-৭॥

ভগবান আমি কী করে এরূপ ভক্ত হতে পারি?

তুমি আমাতেই মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। আমাতে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করলে তুমি যে আমাতেই স্থিতিলাভ করবে তাতে কোনও সংশয় নেই। যদি তুমি এইভাবে চিত্ত স্থির করতে অসমর্থ হও, তবে হে ধনঞ্জয়! তুমি অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে লাভ করার চেষ্টা কর। যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তাহলে মৎ কর্ম পরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করলেও তুমি সিদ্ধিলাভ

করবে। যদি তুমি আমার জন্য কর্ম করতেও অসমর্থ হও তাহলে ভক্তিযোগের আশ্রিত হয়ে মন, বুদ্ধিকে বশীভূত করে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ কর ॥৮-১১॥

ভগবান! এই ক্রমানুসারে কর্মফল ত্যাগ করা কি চতুর্থ শ্রেণীর (নিকৃষ্ট) সাধন হল না?

না ভাই, যোগ (সমত্ব) বর্জিত অভ্যাসের থেকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, যোগরহিত শাস্ত্রীয় জ্ঞানের থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং যোগরহিত ধ্যানের থেকে কর্মফল ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ ; কারণ ত্যাগের দ্বারা তখনই পরমশান্তি লাভ করা যায় ॥১২॥

ভগবান, উপরোক্ত চারটি সাধনার কোনও একটির দ্বারা যে সিদ্ধ ভক্ত আপনাকে প্রাপ্ত হন তাঁর লক্ষণ কী? অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোন কোন গুণ পরিলক্ষিত হয়?

কোনও প্রাণীর প্রতিই তাঁর দ্বেষ্যভাব থাকে না। শুধু তাই নয়, সকল প্রাণীর প্রতিই তাঁর প্রেম এবং সবার ওপর করুণা (দয়া) থাকে। তিনি অহং-বোধ ও মমত্ব বর্জিত হন, ক্ষমাশীল এবং সুখে-দুঃখে সম থাকেন। তিনি সর্ব পরিস্থিতিতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন তাঁর বশে থাকে। তাঁর মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত থাকে। এরূপ দৃঢ় সংকল্পের ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে ॥১৩-১৪॥

আর কে আপনার প্রিয়?

যে ভক্ত কারও উদ্বেগের কারণ হন না এবং যিনি নিজে কখনও কারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না ; এরূপ ঈর্ষা, হর্ষ, ভয়, উদ্বেগবর্জিত ভক্ত আমার প্রিয় ॥১৫॥

ভগবান, আর কে আপনার প্রিয়?

যার নিজের জন্য কোনও বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতির প্রয়োজন নেই, যিনি অন্তরে বাহিরে পবিত্র, যিনি দক্ষ (বুদ্ধিমান) অর্থাৎ যেজন্য মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছেন সেই কাজ (ভগবানকে লাভ করা) তিনি করে নিয়েছেন, যিনি সংসার থেকে মুক্ত, যাঁর হৃদয়ে কোনও চাঞ্চল্য নেই এবং যিনি ভোগ ও সংগ্রহের জন্য কোনও কর্ম করেন না, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ॥১৬॥

আর কে আপনার প্রিয়?

যিনি অনুকূল অবস্থার প্রাপ্তিতে হর্ষান্বিত হন না এবং প্রতিকূল অবস্থার

প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি দুঃখজনক পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলে শোক করেন না এবং সুখদায়ক পরিস্থিতি কামনা করেন না, যিনি শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেছেন, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ॥১৭॥

ভগবান, আর কে আপনার প্রিয়?

যিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা এবং সুখ-দুঃখে সমভাবে থাকেন এবং সাংসারিক আসক্তিবর্জিত হন, যিনি নিন্দা স্তুতিকে সমান বলে মনে করেন, মননশীল, যিনি যে কোনও প্রকারে শরীর-নির্বাহে যিনি খুশী থাকেন, যিনি বাসগৃহ এবং শরীরের সম্পর্কে মমত্ব ও আসক্তিবর্জিত এবং যিনি স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন—এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়* ॥১৮-১৯॥

আপনি তো এতক্ষণ আপনার নিজ সিদ্ধ ভক্তদের প্রিয় বলে জানালেন, এখন বলুন আপনার অত্যন্ত প্রিয় কে?

যিনি শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমার পরায়ণ হয়েছেন এবং এতক্ষণ যে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলি জানালাম সেগুলি আনন্দের সঙ্গে পালন করেন, সেই সাধক ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥২০॥

* এখানে পাঁচ প্রকার সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ প্রকার ভক্তের পৃথক পৃথক লক্ষণ জানাবার অর্থ হল যে, ভক্তদের স্বভাব, তাঁদের সাধন প্রণালী পৃথক পৃথক হয়। তাই কোনও ভক্তের মধ্যে প্রধানত কোনও লক্ষণ দেখা যায় আবার কোনও ভক্তের মধ্যে অন্য কোনও লক্ষণ দেখা যায় ; কিন্তু সংসারের সম্পর্ক ত্যাগ এবং ভগবানে প্রেম ও ভক্তি সকলেরই এক প্রকার হয়।

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যিনি আপনার (সগুণ-সাকার রূপের) উপাসনা করেন, তিনি তো আপনার অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু এবার বলুন যিনি আপনার নির্গুণ-নিরাকার রূপের উপাসনা করেন, তিনি কেমন?

ভাই! তিনি বিবেকবান ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

বিবেক কীসের হয়, ভগবান?

ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের। হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! 'এই' রূপে কথিত শরীরকে বলা হয় 'ক্ষেত্র' আর যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তাঁকে জ্ঞানীরা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (শরীরী বা দেহী) বলেন ॥১॥

সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কী?

হে ভারত! সমস্ত ক্ষেত্রে (দেহে) ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহী) রূপে আমিই বিরাজমান—তুমি তাই জেনো *।

সেই জানা কীরূপ ভগবান?

ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ—এই দুইই যে পৃথক, এটি সম্যকভাবে জানাই আমার মতে জ্ঞান। তাৎপর্য হল যে ক্ষেত্রের সংসারের সঙ্গে ঐক্য থাকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ঐক্য থাকে আমার সঙ্গে—এটি ঠিকমত অনুভব করাই আমার মতে জ্ঞান ॥২॥

---

* এখানে 'সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে'—এ-কথা বলার তাৎপর্য হল, যে এই শরীর তো প্রকৃতির অংশ, অতএব তুমি এর থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে যাও, আর তুমি আমার অংশ, তাই তুমি আমার সম্মুখস্থ হয়ে যাও। আর একটি তাৎপর্য হল যে তুমি যেখানে ক্ষেত্রের (দেহের) সঙ্গে নিজের ঐক্য স্বীকার করে নিয়েছ, সেখানে আমার সঙ্গে তোমার নিজের ঐক্য স্বীকার করে নাও ; কারণ প্রকৃতপক্ষে তোমার ঐক্য দেহের সঙ্গে নেই, আমার সঙ্গেই তোমার স্বতঃসিদ্ধ ঐক্য রয়েছে। এ-কথা তুমি জেনে রাখো।

ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের জন্য কি জানা প্রয়োজন?

ছ'টি বিষয় জানা প্রয়োজন—ক্ষেত্রের বিষয়ে চারটি এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে দুটি। সেই 'ক্ষেত্র' কী, কেমন, কী বিকারবিশিষ্ট এবং কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ; আর 'ক্ষেত্রজ্ঞ' কী, কীরূপ প্রভাবশালী। এইসব তুমি সংক্ষেপে আমার থেকে শোনো ॥৩॥

এর বিস্তারিত বর্ণনা কোথায় আছে, ভগবান?

ঋষিগণের দ্বারা, বেদের সূত্রে এবং নানা প্রকার যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রমাণিত ব্রহ্মসূত্রের পদগুলিতে এর বিস্তারিত পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হয়েছে ॥৪॥

সেই ক্ষেত্র কী?

মূল প্রকৃতি, সমষ্টি বুদ্ধি (মহতত্ত্ব), সমষ্টি অহঙ্কার, পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, (এক) মন এবং ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় ক্ষেত্র—এই চব্বিশটি তত্ত্ববিশিষ্ট* হল ক্ষেত্র ॥৫॥

সেই ক্ষেত্র কীরূপ বিকারসম্পন্ন?

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, প্রাণশক্তি এবং ধারণশক্তি—এই সাতটি বিকারসহ ক্ষেত্রের কথা আমি সংক্ষেপে বলেছি ॥৬॥

বিকারসহ ক্ষেত্রকে 'এই' ভাবে (নিজের থেকে পৃথকরূপে) কীভাবে দেখা যায়, ভগবান?

১) নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার না থাকা।
২) নিজেকে অপরের কাছে প্রদর্শন করবার ভাব না থাকা।
৩) কায়মনোবাক্যে কাউকে বিন্দুমাত্র দুঃখ না দেওয়া।
৪) ক্ষমাভাব।
৫) শরীর, মন ও বাক্যে সারল্য।
৬) জ্ঞানলাভের আশায় গুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে সেবাদি করা।

---

* মূল প্রকৃতি সকলের মা। সেই প্রকৃতি থেকে বুদ্ধিরূপ কন্যার জন্ম। বুদ্ধি থেকে অহঙ্কার রূপ পুত্রের জন্ম হয়। অহঙ্কারের সন্তান হল—পৃথিবী-জল-তেজ-বায়ু-আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। পঞ্চ মহাভূতের সন্তান হল—দশ ইন্দ্রিয়, একমন, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, এই পাঁচটি বিষয়। ইন্দ্রিয়-মন ও পঞ্চ বিষয়ের কোনও সন্তান জন্মায় নি, তাই এগুলি বিকৃতি। অর্থাৎ প্রথম সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি আর বাকি ষোলটি কেবলই বিকৃতি।

৭) দেহের ও অন্তরের শুচি।
৮) নিজ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হওয়া।
৯) মনকে নিজের বশে রাখা।
১০) ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া।
১১) নিরহঙ্কারী হওয়া।
১২) বৈরাগ্যের জন্য জন্ম-মৃত্যু-বার্ধক্য এবং রোগে দুঃখরূপ দোষাদিকে মূল কারণরূপে দেখা।
১৩) আসক্তি বর্জন করা।
১৪) স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে তন্ময় না হওয়া।
১৫) অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাতে চিত্ত সর্বদা সমভাবে রাখা।
১৬) জগৎ-সংসার থেকে উপরতি এবং আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি।
১৭) নির্জনে বাস করার স্বভাব।
১৮) জন-সমাগমে প্রীতির অভাব।
১৯) নিত্য-নিরন্তর পরমাত্মার অস্তিত্ব মনন করা।
২০) সর্বত্র পরমাত্মাকে অনুভব করা।

এই কুড়িটি সাধনার দ্বারা দেহ 'এই' রূপে প্রতিভাত হয়। শরীরকে 'এই' রূপে (নিজের থেকে পৃথকরূপে) দেখাই হল জ্ঞান, আর এর বিপরীত দেহকে আপনার স্বরূপ মনে করা অজ্ঞান ॥৭-১১॥

এই জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব কী?

তা হল জ্ঞেয়-তত্ত্ব (পরমাত্মা)। আমি সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনা করব, যা জানলে অমরত্ব লাভ করা যায়।

সেই জ্ঞেয়-তত্ত্বের স্বরূপ কী?

তিনি আদি-অন্ত রহিত পরম ব্রহ্ম। তাঁকে সৎ-ও বলা যায় না, অসৎ-ও বলা যায় না * ॥১২॥

---

* সেই তত্ত্বকে সৎ-অসৎ কিছুই বলা যায় না। কারণ যেহেতু অসৎ-এর অত্যন্ত অভাব থাকে। অতএব অসৎ-এর ভাব (অস্তিত্ব) না ধরা হলে 'সৎ' শব্দটির প্রয়োগ হয় না। সুতরাং এই পরমাত্ম তত্ত্বকে 'সৎ'-ও বলা যায় না। এই পরমাত্ম তত্ত্বের কখনও অভাব হয় না, তাই একে 'অসৎ'-ও বলা যায় না। তাৎপর্য হল এই যে, এই তত্ত্বে সৎ-অসৎ শব্দের কোনওটাই প্রযোজ্য নয়। এইরূপে সেই পরমাত্ম তত্ত্ব হল নিরপেক্ষ।

তাহলে তিনি কেমন ভগবান?

সর্বত্রই তাঁর হাত এবং পা, সর্বস্থানে তাঁর চোখ, মাথা এবং মুখ, সর্বদিকেই তাঁর কান। তিনি সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রকাশক। তিনি আসক্তিরহিত এবং সমস্ত বিশ্বের ধারক এবং পালন-পোষণকারী। তিনি গুণাদিরহিত এবং সমস্ত গুণের ভোক্তা ॥১৩-১৪॥

একই তত্ত্বে দুইপ্রকার বিরোধী তত্ত্ব কী করে হয়?

অনেক বিরুদ্ধ ভাব সেই একেই মিলিত হয়ে যায় এবং তাতে বিরোধভাব থাকে না ; কেননা স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীর বাইরেও তিনি এবং ভিতরেও তিনিই অবস্থিত, চর-অচর প্রাণীদের রূপেও তিনিই অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য আর কোনও সত্তাই নেই। অত্যন্ত দূরেও তিনি, আবার অতি নিকটেও তিনি *। অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়াদি ও অন্তঃকরণের বিষয় নন। তাই তাতে কোনও বিরোধ নেই ॥১৫॥

এতে বিরোধ না হওয়ার আর কোনও কারণ কি আছে, ভগবান?

এই পরমাত্মা বিভাগরহিত হয়েও বহু বিভাগসম্পন্ন প্রাণীতে (বস্তুতে) বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত। পরমাত্মাই সমস্ত প্রাণীর উৎপাদক, ভরণ-পোষণকারী এবং সংহারকর্তা অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থিতি এবং প্রলয় রূপেও তিনি। সেই পরমাত্মাকে জানা উচিত ॥১৬॥

তাঁর স্বরূপ কী?

ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তা সবই তাঁর দ্বারা

---

* দূর ও নিকট তিনভাবে হয়—দেশকৃত, কালকৃত এবং বস্তুকৃত। দেশ ধরে—দূর-দূরান্তের দেশেও তিনি আবার অত্যন্ত নিকটবর্তী দেশেও তিনি। কাল ধরে—প্রাচীন থেকে অতি প্রাচীন কালেও তিনি ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি থাকবেন,বর্তমানেও তিনি আছেন। বস্তু ধরে—সকল বস্তুর আগেও তিনি ছিলেন, বস্তুগুলির শেষেও তিনি আবার বস্তুগুলির রূপেও তিনি। তাই অতি দূরেও এবং অতি নিকটেও তিনি।

এই শ্লোকটিই এই প্রকরণের সার। এই শ্লোকটি ঠিকভাবে জানলে এবং এর ভাব ঠিকমত মনন করলে মানুষ সংসারেই থাকুক অথবা নির্জনে, এই ভাব স্বতঃই (বিনা পরিশ্রমে, বিনা উদ্যোগে) জাগ্রত থাকে।

প্রকাশিত। তাই তিনি সমস্ত জ্যোতির (জ্ঞানের) জ্যোতি (প্রকাশক)। তাঁর মধ্যে অজ্ঞানের অত্যন্তই অভাব। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই একমাত্র জানার উপযুক্ত। তিনি জ্ঞান (সাধনার) দ্বারা প্রাপ্ত করার যোগ্য। তিনিই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান * ॥১৭॥

আর কী কী জানার আছে এবং সেই জানার মাহাত্ম্য কী ভগবান?

ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়—এই তিনটি জানার প্রয়োজন, যা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। যে ভক্ত এই তিনটি ঠিকমত জানেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি আমার সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা অনুভব করেন ॥১৮॥

ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ঃভক্ত এই তিনটি জেনে তো আপনার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেন, কিন্তু যেসব সাধক শুধুমাত্র জ্ঞান-মার্গেই বিচরণ করতে চান, তাঁদের কী জানা উচিত?

প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ)—এই দুই-ই যে পৃথক তাঁদের এটি জানা প্রয়োজন। প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই অনাদি।

এই দুটিই অনাদি হলে এই গুণ ও বিকার কোথা থেকে উৎপন্ন হল?

গুণ ও বিকার প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। এছাড়া কার্য, করণ এবং কর্তৃত্বেরও হেতু প্রকৃতিই।

পুরুষ কিসের হেতু হয় মহারাজ?

পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বে হেতু হয় ॥১৯-২০॥

পুরুষ কখন ভোক্তৃত্বে হেতু হয়?

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলেই পুরুষ গুণাদির ভোক্তা হন আর গুণাদির সংসর্গেই তাঁর উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয় ॥২১॥

পুরুষের স্বরূপ কী ভগবান?

এই পুরুষ প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখায় 'উপদ্রষ্টা', তার সঙ্গে মিলে অনুমতি দেওয়ায় 'অনুমন্তা', নিজেকে তার ভরণ-পোষণকারী মনে করায় 'ভর্তা', তার সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভোগ করায় 'ভোক্তা' এবং নিজেকে তার প্রভু মনে

* এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক বিরাট রূপের এবং এই শ্লোকে জ্যোতিস্বরূপ—প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে।

করায় 'মহেশ্বর' হয়ে যান। কিন্তু স্বরূপতঃ তাঁকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। তিনি এই দেহে বাস করেও আসলে শরীরের সম্পর্কবর্জিত ॥২২॥

পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ এইরূপে জানলে কী হয়?

এইভাবে গুণাদিসহ প্রকৃতি এবং গুণরহিত পুরুষকে যে ব্যক্তি ঠিকমত জেনে নেন তিনি শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্তব্য-কর্ম করলেও আর জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে যান ॥২৩॥

সেই পুরুষকে জানার আর কোনও উপায় কী আছে?

হ্যাঁ, আছে। কিছু ব্যক্তি ধ্যানযোগের সাহায্যে, কিছু সাংখ্যযোগের সাহায্যে এবং কিছু কর্মযোগের সাহায্যে নিজের মধ্যে স্বতঃই স্ব-স্বরূপকে জেনে নেন ॥২৪॥

এছাড়া আর কোনও সহজ উপায় আছে কি?

হ্যাঁ, আছে। যেসব ব্যক্তি ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ইত্যাদি সাধনা সম্বন্ধে অবহিত নন শুধু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, তাঁরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যান ॥২৫॥

তাঁরা কীভাবে মৃত্যু অতিক্রম করেন, ভগবান?

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! স্থাবর ও জঙ্গম যত প্রাণী উৎপন্ন হয়, তারা সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মেনে নেওয়া সংযোগ থেকেই উৎপন্ন হয় বলে জানবে। তাই ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সংযোগ মেনে না নেওয়াতেই জন্ম-মৃত্যু চক্র অতিক্রম করেন ॥২৬॥

এই সংযোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের কী করা উচিত?

দুটি বিষয় করা উচিত—পরমাত্মার স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধকে চিনে নেওয়া এবং প্রকৃতির (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা। বিষম জগৎ-সংসারে যিনি সমরূপে অবস্থিত এবং বিনাশশীলতার মধ্যে যিনি অবিনাশীরূপে বিরাজমান ও যিনি পরম ঈশ্বর—নিজ পরমস্বরূপকে যিনি এইভাবে দেখেন, তিনিই বাস্তবে সম্যক দ্রষ্টা অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হয়। সর্বত্র সমরূপে পরিপূর্ণ পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব হলে দেহের সঙ্গে একাত্মতাবোধের অভাব হয়। তখন তিনি নিজেকে নিজে হত্যা করেন না অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হলে নিজের মৃত্যু মানেন না। তাই তিনি পরমগতি (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হন ॥২৭-২৮॥

পরমাত্মার সম্বন্ধ কী করে চেনা যায় তা আপনি বললেন, এখন বলুন প্রকৃতির (দেহের) সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে ত্যাগ করা যায়?

সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়—এই বোধ ঠিকমত জাগ্রত হলে নিজের মধ্যে কর্তৃত্বের অভাব অনুভূত হয় এবং যখন তিনি সকল প্রাণীর পৃথক পৃথক ভাগগুলি একই প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং সেই প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন দেখেন, তখনই তিনি ব্রহ্মলাভ করেন। তখন তাঁর আর প্রকৃতির সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকে না ॥২৯-৩০॥

এরূপ হয় কেন?

হে কৌন্তেয়! এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি ও গুণরহিত হওয়ায় স্বয়ং অবিনাশী এবং পরমাত্মস্বরূপই। তিনি এই দেহে বিরাজমান হয়েও প্রকৃতপক্ষে কিছু করেনও না বা লিপ্ত হন না অর্থাৎ তিনি কর্তা বা ভোক্তা নন ॥৩১॥

তিনি লিপ্ত হন না কেন?

আকাশ যেমন সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়েও সূক্ষ্মতার জন্য কোনও বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় না, তেমনই এই পুরুষ সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়েও কোনও দেহেই কখনও লিপ্ত হন না ॥৩২॥

এই পুরুষ কিভাবে কর্তা না হয়ে থাকেন, ভগবান?

হে ভারত! যেমন এক সূর্যই সমস্ত বিশ্বজগৎকে প্রকাশিত করে এবং তা সত্ত্বেও প্রকাশিত করার কোনও কর্তৃত্বভাব তার মধ্যে থাকে না, তেমনই এই ক্ষেত্রজ্ঞ সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করলেও তার কোনও কর্তৃত্ব আসে না, সে শুধু প্রকাশকই হয়ে থাকেন। এইভাবে যিনি জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং প্রকৃতি ও তার কার্য থেকে নিজেকে পৃথক বলে অনুভব করেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥৩৩-৩৪॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই উত্তম এবং পরম জ্ঞানের কথা আমি আবার বলছি, যা জেনে সমস্ত মননশীল মানুষ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন ॥১॥

সেই জ্ঞানের আর কী মহিমা, ভগবান?

সেই জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে সেসব ব্যক্তি আমার স্বধর্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমার সম হয়ে গেছেন তাঁরা মহাসর্গেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হন না ॥২॥

মহাসর্গতে প্রাণীরা কী করে উৎপন্ন হয়?

হে ভারত! মূল প্রকৃতি আমার উৎপত্তি-স্থান এবং আমি তাতেই জীব (চেতন) রূপ গর্ভ স্থাপনা করি, তার থেকেই সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং হে কৌন্তেয়! পৃথক পৃথক যোনিতে যেসব প্রাণী উৎপন্ন হয় আমার মূল প্রকৃতি তাদের মাতৃস্থানীয় এবং বীজ স্থাপনা করায় আমি তাদের পিতার স্থানভুক্ত* ॥৩-৪॥

আপনিই যখন সকল জীবের পিতা তাহলে এইসব জীব কী করে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়?

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এর সংসর্গে অবিনাশী দেহী দেহের মধ্যে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয় ॥৫॥

সত্ত্বগুণের স্বরূপ কী এবং তা দেহীকে কীভাবে দেহে আবদ্ধ করে, ভগবান?

হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বরূপত নির্মল হওয়ায় প্রকাশক এবং নির্বিকার ; কিন্তু এটি সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে ॥৬॥

---

* মহাসর্গের প্রারম্ভে জীবগণকে (নিজ নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুসারে) প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করাই হল ভগবানের দ্বারা বীজ স্থাপনা করা।

রজোগুণের স্বরূপ কী? এবং এটি কীভাবে দেহীকে আবদ্ধ করে?

হে ভরতর্ষভ! তৃষ্ণা এবং আসক্তি থেকে উৎপন্ন রজোগুণকে তুমি রাগাত্মক বলে জেনো। এটি কর্মাসক্তির দ্বারা দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে রাখে ॥৭॥

তমোগুণের স্বরূপ কী এবং সেটি কীভাবে দেহীকে আবদ্ধ করে?

হে অর্জুন! তমোগুণ অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত প্রাণীকে মোহগ্রস্ত করে। এটি প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে রাখে ॥৮॥

বন্ধন করার আগে তিনটি গুণ কী করে, ভগবান?

হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে মানুষের ওপর নিজ অধিকার বিস্তার করে, রজোগুণ মানুষকে কর্মে নিযুক্ত করে নিজ অধিকার বিস্তার করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে এবং প্রমাদ উৎপন্ন করে মানুষের উপর নিজ অধিকার বিস্তার করে ॥৯॥

তিনটি গুণের এক একটি কীভাবে মানুষের ওপর তার অধিকার বজায় রাখে, ভগবান?

হে ভরতবংশীয় অর্জুন! রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥১০॥

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণের লক্ষণ কী?

যখন এই মনুষ্যদেহে ইন্দ্রিয়গুলিতে এবং চিত্তে স্বচ্ছতা ও জানবার আগ্রহ বিকশিত হয়, তখন জানতে হবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে ॥১১॥

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রজোগুণের কী লক্ষণ, ভগবান?

হে ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ অর্জুন! যখন চিত্তে অর্থ প্রভৃতির লোভ, ক্রিয়া করার প্রবৃত্তি, ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্মারম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা ইত্যাদি বেড়ে ওঠে, তখনই বুঝতে হবে যে রজোগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ॥১২॥

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তমোগুণের লক্ষণ কী?

হে কুরুনন্দন! যখন ইন্দ্রিয়গুলিতে ও চিত্তে স্বচ্ছতা (কোনও কিছু বোঝার ক্ষমতা) থাকে না, কোনও কাজে মন লাগে না, করণীয় কর্ম করে না অথচ

যা করার যোগ্য নয় এমন কাজে ব্যাপৃত হয়, চিত্তে মূঢ়তা ব্যাপ্ত হয়ে যায়, এইরূপ বৃত্তি বর্ধিত হওয়ায় বুঝতে হবে যে তখন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে ॥১৩॥

এইসব গুণাদির তাৎকালিক বৃদ্ধিকালে যদি কারও মৃত্যু হয়, তাহলে তার কী গতি হয়?

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদের প্রাপ্য নির্মল উত্তমলোকে গমন করে, রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মানুষ-জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশু, পক্ষী ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে ॥১৪-১৫॥

গুণাদির বৃদ্ধির ফলে এরূপ গতি হয় কেন, ভগবান?

কারণ গুণাদির বৃত্তি যেমন হয়, কর্মও তেমনই হয়ে থাকে। তাই সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান বা মূঢ়তা হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে সাত্ত্বিকাদি গুণের বৃত্তির ফল যেমন হয়, তেমনই সাত্ত্বিকাদি কর্মেরও ফল হয়ে থাকে ॥১৬॥

বৃত্তি এবং কর্মগুলির মূলে কী থাকে?

বৃত্তি এবং কর্মগুলির মূলে থাকে তিনটি গুণ। সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন হয় জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞতা ॥১৭॥

যাঁরা এই তিনগুণে অবস্থান করেন তাঁদের কী গতি হয়, ভগবান?

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন ; রজোগুণে অবস্থানকারীগণ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিন্দনীয় তমোগুণে স্থিত ব্যক্তিগণ নরকাদি প্রাপ্ত হন ॥১৮॥

তাহলে আপনাকে কারা লাভ করেন?

যাঁরা কর্মে গুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করেন না এবং নিজেকে গুণাদির অতীত বলে অনুভব করেন, তাঁরা আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং সেই বিবেকবান ব্যক্তিগণ দেহ উৎপাদনকারী এই ত্রিগুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থারূপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব অনুভব করেন ॥১৯-২০॥

অর্জুন বললেন—হে প্রভো! এই ত্রিগুণাতীত ব্যক্তিগণ কীরূপ লক্ষণযুক্ত হন?

ভগবান বললেন—হে পাণ্ডব! সত্ত্বগুণের 'প্রকাশ', রজোগুণের 'প্রবৃত্তি' এবং তমোগুণের 'মোহ'—এই তিনটি বৃত্তি উৎপন্ন হলে এগুলিতে দ্বেষ করেন না এবং এগুলি না এলে, আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; যিনি উদাসীনের মত বিরাজ করেন, গুণাদি যাঁকে বিচলিত করে না এবং গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হচ্ছে বলে যাঁরা অনুভব করেন—তাঁরা স্বরূপে স্থিত হয়ে নিশ্চেষ্ট রূপে অবস্থান করেন।

গুণাতীত ব্যক্তিদের আচরণ কেমন হয়, ভগবান?

তাঁদের আচরণ সমত্ব বা নির্বিকার ভাবে হয়। যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি স্ব-স্বরূপে নিত্য অবস্থান করেন এবং সুখ-দুঃখে, মাটি-পাথর-সোনাতে, ইন্দ্রিয়াদির প্রিয়-অপ্রিয়ে, নিন্দা-স্তুতিতে, মান-অপমানে, শত্রু-মিত্রে সমভাবে থাকেন এবং কামনা-আসক্তিবশত নতুন কর্ম আরম্ভ করেন না, তাঁকে গুণাতীত বলা হয়।

গুণাতীত হওয়ার উপায় কী?

যে ব্যক্তি অব্যভিচারী অর্থাৎ অনন্যভক্তিতে আমাকে ভজনা করেন তিনি এই ত্রিগুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হন ॥২১॥

আপনাকে ভক্তি করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী কী করে হয়, ভগবান?

ভাই! আমিই ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় অর্থাৎ এগুলি সমস্তই আমার নাম ॥২৭॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদির আধার (আশ্রয়) যদি আপনি হয়ে থাকেন তাহলে এই জগৎ-সংসারের আধার কে ভগবান?

ভগবান বললেন—এই জগৎ-সংসার-রূপ বৃক্ষের আধার ও আশ্রয় আমিই। এই বৃক্ষ উপরদিকে মূলসম্পন্ন আর নীচে এর শাখা-প্রশাখা। কাল পর্যন্তও এটি স্থির না থাকায় একে বলা হয় 'অশ্বত্থ'। এর আদি-অন্ত অজানা বলে এবং প্রবাহরূপে নিত্য হওয়ায় একে বলা হয় 'অব্যয়'। এর পত্রগুলিকে বেদে উক্ত সকাম অনুষ্ঠানের বর্ণনা বলা হয়। এরূপ এই জগৎ-সংসার বৃক্ষকে যিনি যথার্থরূপে জানেন তিনিই বেদাদিকে তত্ত্বত জানেন ॥১॥

এই সংসার-বৃক্ষ আর কেমন?

এই সংসার-বৃক্ষের সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শাখা-প্রশাখাদি নিম্নে, মধ্যস্থলে এবং উপরে সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় এই বৃক্ষ শাখার মুকুল (এইসব বিষয়ে চিন্তা করাই নতুন নতুন মুকুলোদ্‌গম হওয়া)। কিন্তু এই বৃক্ষের শাখাগুলির মূল এই মনুষ্যলোকেই ; কারণ মনুষ্যলোকে কৃতকর্মের ফলই সমস্ত লোকে ভোগ করা হয় ॥২॥

এই বৃক্ষের স্বরূপ কী?

এই সংসার-বৃক্ষের সত্য ও সুন্দর-সুখদরূপ লোকে যেমন দেখতে পায় সেইরকম রূপ চিন্তা করে পাওয়া যায় না ; এর আদিও নেই, অন্তও নেই এবং স্থিতিও নেই।

এর সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য মানুষের তাহলে কী করা উচিত?

তাদাত্ম্য, মমত্ব ও কামনারূপ শাখাগুলির দৃঢ় মূলবিশিষ্ট সংসার-বৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের সাহায্যে ছেদন করে সেই পরমপদ পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করতে হয়।

অনুসন্ধান করতে না পারলে কী করা উচিত, ভগবান?

যাঁকে লাভ করলে মানুষ পুনরায় ইহজগতে ফিরে আসে না এবং যাঁর

দ্বারা অনাদিকাল হতে এই সৃষ্টির বিস্তার, সেই আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণাগত হওয়া উচিত ॥৩-৪॥

শরণাগত হলে কী হবে?

শরণাগত হলে মানুষ মান-অপমান ও মোহবর্জিত হয়, আসক্তি না থাকায় তাঁদের মধ্যে মমত্ব প্রভৃতি দোষগুলি থাকে না, তাঁরা নিত্য-নিরন্তর পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন, তাঁরা সমস্ত কামনারহিত হন এবং সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব বিমুক্ত হয়ে অবিনাশী পদ লাভ করেন ॥৫॥

সেই অবিনাশী পদ কেমন, ভগবান?

সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি যাকে প্রকাশিত করতে সক্ষম হয় না এবং যেখানে গেলে মানুষ আর জগতে ফিরে আসে না, সেই অবিনাশী পদই আমার পরমধাম ॥৬॥

কেন আর জগতে ফিরে আসে না?

এই দেহে জীব রূপে আত্মা সর্বদা আমারই অংশীভূত, তাই আমাকে প্রাপ্ত হলে জীব আর পুনরায় জগতে ফিরে আসে না। কিন্তু জীব ভ্রমবশত এই প্রকৃতির কার্য ইন্দ্রিয়াদি ও মনকে নিজের বলে মেনে নেয় ॥৭॥

ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের মনে করলে কী হয়?

বায়ু যেমন গন্ধ বহন করে নিয়ে যায় তেমনই শরীর, ইন্দ্রিয়াদির কর্তা হয়ে জীবাত্মাও যে দেহকে ত্যাগ করে, সেখান থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করে অন্য দেহে আশ্রয় নেয় অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে ॥৮॥

সেখানে সে কী করে, ভগবান?

সেখানে সে মনের আশ্রয় নিয়ে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয়কে আসক্তিসহ উপভোগ করে থাকে ॥৯॥

আসক্তিসহ বিষয় উপভোগ করলে কী হয়?

গুণাদিযুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তন এবং ভোগাদি উপভোগকালেও জীবাত্মা স্বরূপত নির্লিপ্ত থাকে। কিন্তু যাঁরা আসক্তি সহকারে বিষয় উপভোগ করেন, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ তা জানেন না।

তাহলে কে জানেন?

জ্ঞান-চক্ষুবিশিষ্ট বিবেকবান ব্যক্তিরাই জানেন ॥১০॥

জ্ঞান-চক্ষু কাদের খোলা থাকে আর কাদের খোলা থাকে না, ভগবান?

যাঁরা তাঁদের চিত্তকে শুদ্ধ করেছেন অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্তকে গুরুত্ব দিয়েছেন এরূপ প্রযত্নবান যোগীগণ আপনাতে অবস্থিত তত্ত্ব অবগত হন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যায় ; কিন্তু যাঁরা তাঁদের চিত্ত শুদ্ধ করেন নি অর্থাৎ স্বতঃপ্রাপ্ত বিবেককে সমাদর করেন নি, এরূপ বিবেকহীন মানুষ চেষ্টা করলেও এই তত্ত্ব জানতে পারেন না অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান-চক্ষু খোলে না ॥১১॥

আপনাতে অবস্থিত তত্ত্ব কী?

আমিই আছি। সূর্যে অবস্থিত যে তেজের দ্বারা সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে বিরাজমান, তা তুমি আমার তেজ বলেই জানবে। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে আমিই তেজরূপে অবস্থান করে সমস্ত জগৎ-সংসারকে প্রকাশিত করি ॥১২॥

ভগবান! আপনি আর কী কী করেন?

আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি, আমিই চন্দ্ররূপে সমস্ত ওষধিকে অর্থাৎ বনস্পতিকে পরিপুষ্ট করি ॥১৩॥

আপনি আর কী কী করেন?

প্রাণীদের দেহে অবস্থিত হয়ে আমিই প্রাণ ও অপান বায়ুযুক্ত বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) হয়ে প্রাণীদের আহার্য দ্রব্যাদি চারভাবে (চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয়) পরিপাক করি ॥ ১৪ ॥

আপনার আর কী কী বিশেষত্ব আছে?

সকলের হৃদয়ে আমি অবস্থান করি। আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহন (সংশয়াদি দোষ নাশ) হয়। আমিই বেদসমূহের জ্ঞাতব্য। বেদের তত্ত্বাদি নির্ণয়কারী এবং বেদবেত্তাও আমিই ॥১৫॥

আপনি যাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁরা কে?

এই মনুষ্যলোকে ক্ষর (বিনাশী) এবং অক্ষর (অবিনাশী) পুরুষ দু'প্রকারের। এর মধ্যে সকল প্রাণীর শরীর বিনাশশীল এবং জীবাত্মাকে অবিনাশী বলা হয় ॥১৬॥

ক্ষর ও অক্ষর ব্যতীত আর কিছু আছে কী?

ক্ষর ও অক্ষর ব্যতীত অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, যাঁকে জগতে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং যিনি ত্রিলোকের ভরণ-পোষণকারী অবিনাশী ঈশ্বর ॥১৭॥

উত্তম পুরুষ তো অন্য একজন, তাহলে আপনি কে, ভগবান?

ভাই! সেই উত্তম পুরুষ আমিই। আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ॥১৮॥

আপনি যদি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ, তাতে মানুষের কী লাভ হবে, ভগবান?

হে ভারত! যে মোহবর্জিত ভক্ত আমাকে এইভাবে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর আর কোনও কিছু জানার বাকি থাকে না। তখন তিনি সর্বভাবে শুধু আমারই ভজনা করেন অর্থাৎ আমাতেই ব্যাপৃত থাকেন ॥১৯॥

ব্যাপার যখন এইরূপ তাহলে সকলে আপনাতেই কেন মন নিবিষ্ট করেন না, ভগবান?

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! আমি তোমাকে যে কথা বললাম তা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। এগুলি জেনে আমার ভক্তগণ জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য, কৃত-কৃত্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যায় ॥২০॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

সেই অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ের অধিকারী কে হন, ভগবান?

যাঁরা দৈবী-সম্পদসম্পন্ন তাঁরাই হয়ে থাকেন *।

দৈবী-সম্পদশালী ব্যক্তিদের লক্ষণ কি?

ভগবান বললেন—সেগুলি এইরূপ ঃ—

১) আমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ভরসা করে নির্ভয়ভাবে থাকা।

২) আমাকে প্রাপ্ত করার জন্য অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকা।

৩) আমাকে স্বরূপতঃ জানার জন্য সর্ব পরিস্থিতিতে সমভাবে থাকা।

৪) সাত্ত্বিকভাবে দান করা।

৫) ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রাখা।

৬) নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা।

৭) শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসমূহকে নিজ জীবনে পালন করা।

৮) কর্তব্য পালনকালে যে সমস্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় সেসব হাসিমুখে সহ্য করা।

৯) কায়-মনো-বাক্যে সরলতা।

১০) কায়-মনো-বাক্যে কোনও প্রাণীকে বিন্দুমাত্র কষ্ট না দেওয়া।

১১) যা যেমন দেখা, শোনা ও বোঝা যায়, সেটিকে ঠিক তেমনই প্রিয় বাক্যের সাহায্যে বলা।

১২) আমার স্বরূপ মনে করে কখনও কারও ওপর রাগ না করা।

১৩) জাগতিক কামনা পরিত্যাগ করা।

১৪) রাগ-দ্বেষাদিবশত হৃদয়ে কোনও চাঞ্চল্য না হওয়া।

১৫) নিন্দা না করা।

---

* পরমাত্মাকে বলা হয় 'দেব'। পরমাত্মার সম্পদ বা গুণকে বলা হয় 'দৈবী-সম্পদ' অর্থাৎ যে সাধনা পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করার কারণ হয়, সেই সাধনাকে বলা হয় 'দৈবী-সম্পদ'।

১৬) সর্ব জীবে সদয় থাকা।

১৭) সাংসারিক বিষয়াদিতে লোভ না হওয়া।

১৮) কোমল হৃদয়সম্পন্ন হওয়া।

১৯) লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা।

২০) চপল (অধৈর্য) না হওয়া।

২১) দেহে ও বাক্যে তেজস্বী হওয়া।

২২) দণ্ড প্রদান করার সামর্থ্য থাকলেও অপরাধীকে ক্ষমা করা।

২৩) সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্য রক্ষা করা।

২৪) শরীরকে শুদ্ধ (পবিত্র) ভাবে রাখা।

২৫) প্রতিশোধের স্পৃহা না থাকা।

২৬) নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব না থাকা।

হে ভরতর্ষভ অর্জুন! এগুলি সবই দৈবী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিদের লক্ষণ ; এই লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের আমার ভক্তির অধিকারী বলে মনে করা উচিত * ॥১-৩॥

কারা অনধিকারী হয়ে থাকে, ভগবান?

আসুরী-সম্পদশালী ব্যক্তিগণ **।

আসুরী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষণ কী?

সেগুলি এইরূপ—

১) দম্ভ (লোক দেখানো) ভাব।

২) অহঙ্কার অর্থাৎ মমত্বযুক্ত জিনিস নিয়ে নিজের বড়ত্ব জাহির করা।

---

* এখানে প্রশ্ন হল যে যাঁরা এরূপ লক্ষণযুক্ত তাঁরা তো ভক্তির অধিকারী কিন্তু যাঁদের এই লক্ষণ নেই সেই দুরাচারী ব্যক্তিরা কি ভক্তির অধিকারী হতেই পারেন না? এ-কথা ঠিক হলেও যদি কোনও দুরাচারী অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হয় তাহলে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় অর্থাৎ ভগবদ্‌কৃপায় দৈবী-সম্পদের লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায় (গীতা ৯/৩০-৩১)।

** প্রাণকে বলা হয় 'অসু'। যে ব্যক্তি সেই প্রাণেতেই রমণ করতে চান, প্রাণকে রক্ষা করতে চান, তাঁকে 'অসুর' বলা হয়। অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে একত্ব মেনে নিয়ে যারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমরা যেন কখনও না মরি, সর্বদা বেঁচে থেকে সুখভোগ করি'— তাদের বলা হয় 'অসুর'। সেই অসুরদের লক্ষণকেই বলা হয় 'আসুরী-সম্পদ'।

৩) অহংবোধসম্পন্ন বিষয় নিয়ে অভিমান করা।

৪) ক্রোধ।

৫) মন, বাক্য ও ব্যবহারে কঠিনভাব রাখা।

৬) সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যাদি জ্ঞানকে (বিবেককে) গুরুত্ব না দেওয়া।

হে পার্থ! এ সমস্তই আসুরী-সম্পদশালী ব্যক্তিদের লক্ষণ, অর্থাৎ এই লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়শই আমার ভক্তির অধিকারী হয় না। ॥৪॥

এই দৈবী ও আসুরী-সম্পদের ফল কী, ভগবান?

দৈবী-সম্পদ মুক্তি প্রদানকারী এবং আসুরী-সম্পদ বন্ধনকারী হয়ে থাকে। কিন্তু হে পাণ্ডব! তার জন্য তোমার শোক বা চিন্তা করা উচিত নয় ; কারণ তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছ ॥৫॥

আসুরী-সম্পদ কী করে বন্ধনকারক হয়?

ইহলোকে দু' প্রকার প্রাণী সৃষ্টি হয়—দৈবী এবং আসুরী। দৈবী-সম্পদের কথা তো আমি বিস্তারিত বলেছি, এখন পার্থ! তুমি আসুরী-সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে শোন। আসুরী-সম্পদধারী ব্যক্তিরা কিসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত আর কিসে নিবৃত্ত হওয়া উচিত তা জানে না এবং তাদের মধ্যে বাহ্যশুদ্ধি, সদাচার ও সত্য-আচরণ কিছুই থাকে না ॥৬-৭॥

তাঁদের এইসব শৌচাচার কেন থাকে না, ভগবান?

তাঁদের দৃষ্টি বিপরীতমুখী হয়। তাঁরা বলে থাকেন এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ এখানকার কোনও কিছুই (শাস্ত্র, ধর্মাদি) সত্য নয়। এই জগতে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্যের কোনওই মর্যাদা নেই। কোনও ঈশ্বরই এই জগৎ সৃষ্টি করেন নি ; কেবলমাত্র কামবশত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগবশত এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এর উৎপত্তির আসল কারণ কাম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নেই ॥৮॥

সেই আসুরী-সম্পদধারীগণের কর্ম কিরূপ হয়ে থাকে?

উপরোক্ত নাস্তিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁদের নিত্যস্বরূপকে (আত্মাকে) মানেন না, তাঁদের বুদ্ধি নগণ্য হয়ে থাকে এবং তাঁদের কর্মও অত্যন্ত উগ্র (ভয়ানক) হয়ে থাকে। তাঁরা জগতের শত্রু বলে বিবেচিত হন। এরূপ মানুষ অপরকে ধ্বংস করার জন্যই জন্ম নিয়ে থাকেন।

তাঁরা যে কামনার কখনওই পূরণ হবে না তার আশ্রয় গ্রহণ করে দম্ভ, অহঙ্কার ও গর্বে পরিপূর্ণ হয়ে অপবিত্র নিয়মাদি পালন করে মোহবশত নানা দুরাশার বশবর্তী হয়ে জগতে বিচরণ করেন ॥৯-১০॥

তাঁদের ভাব কেমন হয়?

তাঁরা আমৃত্যু বড় বড় চিন্তার আশ্রয় নিয়ে বিষয় ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন এবং এইগুলিকেই পুরুষার্থ মনে করে নিশ্চিন্ত থাকেন ॥১১॥

তাঁরা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে থাকেন, ভগবান?

বহু আশার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এইসব ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে ভোগবিলাসের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন ॥১২॥

তাঁদের মনের ইচ্ছা কেমন হয়ে থাকে?

আজ এত সম্পদ লাভ করেছি, এবার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। আমার তো এত অর্থ আছেই, আরও এত অর্থ হবে।

তাদের আর কী কী ভাব থাকে?

সেই শত্রুকে আমি শেষ করেছি, অন্যান্য শত্রুদেরও আমি নাশ করব। আমি শক্তিমান, সিদ্ধ, বলশালী, সুখী এবং ভোগ করতে এসেছি। আমি অত্যন্ত ধনবান। আমার অনেক সঙ্গী আছে। আমার সমকক্ষ কে হতে পারে? আমি অনেক যজ্ঞ করব, দান করব .এবং আয়েস করব। এইভাবে এরা অজ্ঞতাবশত মনের ইচ্ছা পোষণ করে ॥১৩-১৫॥

মৃত্যুর পর এরা কোন গতি লাভ করে, ভগবান?

নানাপ্রকার ভ্রমে বিভ্রান্ত হয়ে, মোহজালে জড়িত হয়ে এবং সম্পদ সংগ্রহ ও বিষয় ভোগে আসক্ত হয়ে এইসব ব্যক্তি ভীষণ নরকে পতিত হয় ॥১৬॥

আসুরী-সম্পদসম্পন্ন, ভোগাসক্ত, পতনকারী সেইসব মানুষের কীরূপ মনোভাব হয়?

এঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে, অহঙ্কার এবং অর্থ গর্বে গর্বিত হয়ে থাকেন।

ভগবান এঁরা শুভ কর্মাদিও করে থাকেন তো?

হ্যাঁ, এঁরা যজ্ঞাদি শুভকর্ম যা কিছু করেন তা সবই দম্ভ ও লোক দেখানোর জন্য অবিধিপূর্বক করে থাকেন ॥১৭॥

তাঁরা কেন এমন করেন?

কেননা তাঁরা অহঙ্কার, দম্ভ, অভিমান, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

ভগবান, তাঁদের আর কী ভাব হয়?

এইসব ব্যক্তি তাঁদের ও অপরের দেহস্থিত অন্তর্যামীরূপ আমাকে দ্বেষ করে থাকেন এবং আমার ও অপরের গুণাদিতে দোষদৃষ্টি রাখেন ॥১৮॥

যাঁদের এইরূপ আসুরী-ভাব থাকে, তাঁদের পরিণাম কী ভগবান?

এইসব দ্বেষকারী, ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন, জগতের অতি নীচ ও অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার কুকুর, গাধা, বাঘ, সাপ ইত্যাদি হীন আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করে থাকি ॥১৯॥

তারপর কী হয়?

হে কৌন্তেয়! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না করে জন্ম-জন্ম ধরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হতে থাকে এবং পরে আরও ভীষণ গতি অর্থাৎ ঘোর নরক প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

তাঁদের অধম যোনি এবং অধম গতি (নরক) লাভ করার প্রধান কারণ কী, ভগবান?

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ এবং এগুলিই মানুষের পতনের কারণ। তাই এই তিনটি পরিত্যাগ করা উচিত ॥২১॥

এগুলি পরিত্যাগ করলে কী হয়?

হে কৌন্তেয়! যেসব ব্যক্তি এই তিনটি দোষরহিত হয়ে নিজ কল্যাণের জন্য আচরণ করেন অর্থাৎ যাঁরা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচরণাদি পরিত্যাগ করে শুধু নিজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে বিধিপূর্বক আচরণ করেন, তাঁরা পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥২২॥

কারা পরমগতি প্রাপ্ত হন না?

যাঁরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে থাকেন অর্থাৎ নিজমনে যা ভাল বোঝেন সেই কাজ করে থাকেন, সেইসব মানুষ

সিদ্ধি (অন্তরে শুদ্ধি) পান না, সুখও পান না এবং পরমগতিও প্রাপ্ত হন না ॥২৩॥

ভাল বা মন্দ কাজ কি করে চেনা যায়?

কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ—এরূপ জেনে তোমাকে শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্মই করতে হবে অর্থাৎ শাস্ত্র মেনেই সমস্ত কাজ করা উচিত ॥২৪॥

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি না জেনে শ্রদ্ধা সহকারে ভজন-পূজন করেন, তাঁদের শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক, নাকি তামসিক? ॥১॥

ভগবান বললেন—মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ॥২॥

স্বভাবজাত এই শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয় কেন?

হে ভারত! সকল মানুষেরই শ্রদ্ধা তাঁদের অন্তরের অনুকূল হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রাণী। সুতরাং যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, তেমনই তার স্বরূপ অর্থাৎ তার নিষ্ঠাও সেরূপই হয় ॥৩॥

কী করে সেই শ্রদ্ধা (নিষ্ঠা)কে জানা যায়?

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করে থাকেন। রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ-রক্ষগণের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করে থাকেন ॥৪॥

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের কী পরিচয়, ভগবান?

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কামনা, আসক্তি ও হঠকারিতা যুক্ত হয়ে শাস্ত্রবিধিবর্জিত ভীষণ তপস্যা করেন এবং নিজের পাঞ্চভৌতিক শরীরকে এবং (আমার বিরুদ্ধাচরণ করে) অন্তরে স্থিত আমাকেও কষ্ট দেন। এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিকে তুমি আসুরী-স্বভাবের বলে জানবে ॥৫-৬॥

আপনি এতক্ষণ পূজা ও তপস্যানিরত শ্রদ্ধাযুক্ত ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের কথা বলেছেন ; কিন্তু যাঁরা পূজা, তপস্যা ইত্যাদি করেন না, তাঁদের কী করে চেনা যায়?

খাদ্যরুচির সাহায্যে তাঁদের চেনা সম্ভব হয় ; কেননা খাদ্য সকলেই গ্রহণ করেন ; তাই আহারও সকলের তিন প্রকারের প্রিয় হয়। তেমনই যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও তিনভাবে প্রিয় হয়। তুমি সেই প্রভেদগুলি শোনো ॥৭॥

সাত্ত্বিক মানুষদের কেমন আহার পছন্দ?

আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রসন্নতাবর্ধক, স্থির, বলকারক, স্নিগ্ধ, সরস—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের এরূপ আহার প্রিয় হয়ে থাকে ॥৮॥

রাজসিক ব্যক্তিদের কেমন আহার প্রিয়?

অতি কটু, টক, লবণাক্ত, গরম, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ এবং প্রদাহকারী খাদ্য রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে, যা দুঃখ-শোক ও রোগ প্রদানকারী ॥৯॥

তামসিক ব্যক্তির আহারের রুচি কেমন হয়?

অর্ধপক্ব, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত (মদ, পিঁয়াজ, রসুন সম্বলিত,) বাসী, উচ্ছিষ্ঠ, এবং অত্যন্ত অপবিত্র (মাংস, মাছ, ডিম ইত্যাদি) খাদ্যদ্রব্য তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয় ॥১০॥

আপনি যজ্ঞ, তপস্যা ও দানেরও তিনপ্রকার পার্থক্যের কথা শুনতে নির্দেশ দিয়েছিলেন *। এখন আপনি বলুন যজ্ঞ তিন প্রকারের হয় কী করে?

যজ্ঞ করা কর্তব্য—মনে এই ভাব নিশ্চিত করে ফলেচ্ছাবর্জিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যে যজ্ঞ করে থাকেন, তাকে বলে সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥১১॥

রাজসিক যজ্ঞ কেমনভাবে হয়?

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যে যজ্ঞ ফলেচ্ছাসহ অর্থাৎ নিজ নিজ স্বার্থের জন্য করা হয় অথবা লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে তুমি রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে ॥১২॥

---

* এর আগে পূজা-পাঠ এবং আহার্য অনুসারে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে তাতে অজ্ঞতাপূর্বক শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারীদের পরিচয় জানা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞাদি শুভকর্ম করেন তাঁকে কীভাবে জানা যায়—তা জানাবার জন্য ভগবান যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের তিনপ্রকার প্রভেদের কথা শুনতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তামসিক যজ্ঞ কীরূপে হয়?

যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধি বর্জিত, অন্ন-দান রহিত, মন্ত্রহীন, বিনা দক্ষিণায় অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয়, তাকে বলা হয় তামসিক যজ্ঞ ॥১৩॥

ভগবান, এবার বলুন তপ কয় প্রকারের হয়?

তপ তিন প্রকারের—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পূজা করা ; জল-মৃত্তিকাদির দ্বারা দেহ পবিত্র রাখা, শারীরিক ক্রিয়াদি সহজ-সরল রাখা অর্থাৎ জেদ-বিদ্বেষ না রাখা ; ব্রহ্মচর্য পালন করা এবং নিজ শরীর দ্বারা কাউকে কোনওপ্রকার কষ্ট না দেওয়া—এগুলিকে বলা হয় শারীরিক তপ ॥১৪॥

বাচিক তপ কীভাবে হয়?

যা কারও উদ্বেগের কারণ হয় না, সত্য, প্রিয় ও হিতকারী ; ধর্মগ্রন্থাদির অধ্যয়ন, শাস্ত্রবিধি অভ্যাস (নাম-জপ করা)—এগুলিকে বলা হয় বাচিক তপ ॥১৫॥

মানসিক তপ কাকে বলে?

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মননশীলতা, আত্মসংযম এবং ভাব শুদ্ধি—এগুলি হল মানসিক তপ ॥১৬॥

উপরিউক্ত তিনপ্রকার তপ যদি পরম শ্রদ্ধা সহকারে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে কোনও ব্যক্তি করেন, তবে তাকে সাত্ত্বিক তপ বলা হয় ॥১৭॥

রাজসিক তপ কাকে বলা হয়, ভগবান?

যে তপ নিজ সৎকার, মান ও পূজার জন্য অথবা অপরকে দেখাবার জন্য করা হয় ; ইহলোকে অনিশ্চিত এবং বিনাশশীল ফল প্রদানকারী সেই তপকে রাজসিক তপ বলা হয় ॥১৮॥

তামস তপ কেমন হয়?

যে তপস্যা মূঢ়তাপূর্বক হঠকারিতার সঙ্গে নিজেকে বা অপরকে কষ্ট দিয়ে করা হয়, তাকে বলা হয় তামস তপ ॥১৯॥

ভগবান! এবার বলুন দান তিন প্রকারের হয় কীভাবে?

দান করা কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে, যে দান প্রত্যুপকারের চিন্তা ত্যাগ করে দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করে করা হয়, তাকে বলে সাত্ত্বিক দান ॥২০॥

রাজসিক দান কাকে বলে?

যে দান, প্রত্যুপকার পাওয়া যাবে বলে অথবা ফলের বাসনা নিয়ে

'দিতে হচ্ছে বলে দেওয়া'—এরূপ দুঃখের সঙ্গে দান করা হয়, তাকে বলে রাজসিক দান ॥২১॥

তামসিক দান কাকে বলে?

যে দান সৎকার ছাড়া, অবজ্ঞাপূর্বক, অযোগ্য দেশ ও কালে অপাত্রে করা হয়, তাকে বলে তামসিক দান ॥২২॥

শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ, তপ ও দান-ক্রিয়া কীভাবে শুরু করেন, মহারাজ?

ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি মন্ত্র দ্বারা যে পরমাত্মার নির্দেশ করা হয়েছে, সেই পরমাত্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের সূচনা করেছেন। অতএব সেই পরমাত্মার নাম স্মরণ করেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত ॥২৩॥

ভগবান, কোন স্থানে 'ওঁ' এর প্রয়োগ হয়?

বৈদিক সিদ্ধান্ত যাঁরা মানেন সেইসব ব্যক্তির শাস্ত্রবিধি সহকারে যজ্ঞ, দানও তপস্যারূপ ক্রিয়াদি সর্বদা ওঁ উচ্চারণ করে আরম্ভ হয় ॥ ২৪ ॥

'তৎ' এর প্রয়োগ কোথায় হয়?

'তৎ' নামে উল্লিখিত সেই পরমব্রহ্মই সব—এরূপ মনে করে মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তিগণ ফলেচ্ছারহিত হয়ে নানাপ্রকার যজ্ঞ, তপ ও দানরূপ ক্রিয়া করে থাকেন ॥২৫॥

'সৎ' এর প্রয়োগ কোথায় হয়?

হে পার্থ! পরমাত্মার 'সৎ' নামের প্রয়োগ অস্তিত্বমাত্রে এবং শ্রেষ্ঠভাবে করা হয়। শ্রেষ্ঠ কর্মাদির সঙ্গেও 'সৎ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। যজ্ঞ, তপ ও দানে মানুষের যে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, তাকেও 'সৎ' বলা হয়। এ-কথাও বলা হয় যে সেই পরমব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় সেইসব কর্মকেও 'সৎ' বলা হয় ॥২৬-২৭॥

'অসৎ' কর্ম কাকে বলা হয়, ভগবান?

হে পার্থ! অশ্রদ্ধার সঙ্গে যদি যজ্ঞ, দান বা তপস্যা করা হয় সেগুলিকে বলা হয় 'অসৎ'। সেগুলি ইহলোকে অথবা মৃত্যুর পর পরলোকে কোথাও-ই সৎ-ফল প্রদান করে না ॥২৮॥

❖ ❖ ❖

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো! হে অন্তর্যামী! হে কেশিনিষূদন! আমি সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) ও ত্যাগের (কর্মযোগের) তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে চাই ॥১॥

ভগবান বললেন—আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিষয়ে অন্যান্য দার্শনিকদের চারটি মত জানাচ্ছি।

সেই চারটি মত কী মহারাজ?

১) কিছু বিদ্বান ব্যক্তি কাম্য কর্ম ত্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলেন।

২) কেউ আবার সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করাকেই ত্যাগ বলেন।

৩) কেউ কেউ বলে থাকেন কর্মকে দোষযুক্ত মনে করে ত্যাগ করা উচিত।

৪) কেউ কেউ বলেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় ॥২-৩॥

এগুলি তো দার্শনিকদের বলা চারটি মত কিন্তু এই বিষয়ে আপনার মত কী, ভগবান?

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই দুইয়ের মধ্যে তুমি প্রথমে ত্যাগের বিষয়ে আমার অভিমত শোন ; কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! বলা হয় ত্যাগ তিন প্রকারের। যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মগুলি ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং সেগুলি যদি না করা হয় তবে অবশ্যই করা উচিত। কারণ এর প্রতিটি কর্মই মনীষিদের পবিত্র করে ॥৪-৫॥

শুধু এইটুকু কর্মই করা উচিত?

হে পার্থ! এখন যা বললাম সেই যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মসমূহ এবং তাছাড়াও শাস্ত্রবিহিত অন্যান্য কর্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক করা উচিত—এই হল আমার নিশ্চিত করা উত্তম মত ॥৬॥

তিন প্রকার যে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, তার স্বরূপ কী ভগবান?

স্বধর্মরূপে নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ করা কারোরই উচিত নয় *। মোহবশত এগুলি ত্যাগ করলে তাকে বলা হয় তামস ত্যাগ ॥৭॥

রাজসিক ত্যাগের স্বরূপ কী?

কর্তব্য-কর্ম পালনে শুধুমাত্র দুঃখই হয়—এই ভেবে শারীরিক কষ্টের ভয়ে যে কর্ম ত্যাগ করা হয়, তাকে বলে রাজসিক ত্যাগ। এরূপ কর্মত্যাগীর ত্যাগের ফল যে শান্তি, তা প্রাপ্তি হয় না ॥৮॥

সাত্ত্বিক ত্যাগের স্বরূপ কী?

হে অর্জুন! স্বধর্ম পালন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য—এই মনে করে কর্মের আসক্তি ও ফলাকাঙক্ষা পরিত্যাগ করে নিয়ত (শাস্ত্র নির্দিষ্ট) কর্ম পালন করাই হল সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥৯॥

ত্যাগী ব্যক্তি কেমন হয়, ভগবান?

যিনি দ্বেষ বর্জন করে সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেন এবং আসক্তিরহিত হয়ে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম পালন করেন এরূপ বুদ্ধিমান ত্যাগী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিজ স্বরূপে স্থিত হন ॥১০॥

কর্ম করাতে যেন আসক্তি না হয় এবং পরিত্যাগে যেন দ্বেষ না হয়—এত ঝামেলা করার দরকার কী? কর্ম যদি একেবারেই পরিত্যাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে?

দেহধারী মানুষের পক্ষে কর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভব নয়। তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ত্যাগী বলা হয় ॥১১॥

---

* বিহিত কর্ম ও নিয়ত (শাস্ত্র নির্দিষ্ট) কর্মে পার্থক্য কী? শাস্ত্রে যেসব কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় বিহিত কর্ম। সেইসব বিহিত কর্ম সামগ্রিকরূপে কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয় ; কেননা শাস্ত্রে সমস্ত বার ও তিথিতে ব্রত পালনের বিধান আছে। যদি কোনও এক ব্যক্তি এইসব বার ও তিথিগুলির ব্রত পালন করেন, তাহলে তিনি আহার করবেন কবে? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে মানুষের পক্ষে সমস্ত বিহিত কর্ম করা প্রয়োজন নয়। কিন্তু ঐ বিহিত কর্মেও বর্ণ, আশ্রম ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যার জন্য যে কর্তব্য প্রয়োজন, তার পক্ষে সেটিই নিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম বলা হয়। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চার বর্ণের যে যে বর্ণের জন্য জীবিকা ও শরীর-নির্বাহের যেসব নিয়মাদি আছে, সেই সেই বর্ণের জন্য সেগুলিই হ'ল 'নিয়ত-কর্ম' বা স্বধর্ম।

কর্মফল কয় প্রকারের হয়, ভগবান?

কর্মফল তিন প্রকারের—অনুকূল পরিস্থিতিকে বলা হয় ইষ্ট, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে বলা হয় অনিষ্ট এবং যাতে কিছুটা ইষ্ট ও কিছুটা অনিষ্ট মিশ্রিত থাকে, তাকে বলা হয় মিশ্র। এই তিন প্রকারের কর্মফল ফলাকাঙক্ষা নিয়ে কর্ম করলে মৃত্যুর পরও হয়ে থাকে ; কিন্তু যাঁরা ফলাকাঙক্ষা ত্যাগ করে থাকেন, তাঁদের কখনওই (ইহলোকে বা পরলোকে—কোথাও) হয় না।

যে কর্মের ফল তিন প্রকারের, সেই কর্মের হেতু কী?

হে মহাবাহো! কর্মের অবসানকারী সাংখ্যসিদ্ধান্তে সমস্ত কর্ম সিদ্ধ হওয়ার পাঁচটি হেতুর কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তুমি আমার কাছে শোনো ॥১২-১৩॥

সেই হেতুগুলি কী, ভগবান?

শরীর, কর্তা, বিবিধকরণ এবং সেগুলির নানাপ্রকার পৃথক পৃথক চেষ্টা ও সংস্কার—এই পাঁচ হেতু। মানুষ শরীর, বাক্য ও মনের সাহায্যে শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ যা কিছু কর্ম করে, এই পাঁচটি হল তার হেতু ॥১৪-১৫॥

কর্ম সম্পাদনে এই পাঁচ হেতু বলার তাৎপর্য কী?

শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয় আত্মার কোনও কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু যিনি কর্মাদির বিষয়ে আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করেন সেই মূঢ় ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না ; কারণ তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধ নয় ॥১৬॥

আত্মাকে অকর্তা বলে মনে করলে কী হয়, ভগবান?

যাঁর মধ্যে 'আমি করি'—এই অহংভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত নয়, তিনি সমস্ত প্রাণী বধ করলেও হত্যা করেন না এবং ফলে আবদ্ধ হন না ॥১৭॥

কর্মের সঙ্গে যখন আত্মার কোনও সম্বন্ধই নেই, তাহলে কার প্রেরণাতে কর্ম সম্পাদিত হয়?

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটির দ্বারা কর্মপ্রেরণা আসে এবং করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনের সাহায্যে কর্ম সংগ্রহ হয় ॥১৮॥

কর্মপ্রেরণা ও কর্ম সংগ্রহ এই দুটির মধ্যে মুখ্য কোনটি এবং তার প্রধান পার্থক্য কী?

গুণাদির সম্বন্ধে প্রত্যেক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্যের গণনাকারী শাস্ত্রে

গুণাদি অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার তিনটি করে মুখ্য পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তুমি মন দিয়ে শোনো ॥১৯॥

জ্ঞানের তিন প্রকার বিভাগের মধ্যে সাত্ত্বিক জ্ঞান কোনটি?

যে জ্ঞানের দ্বারা সাধক সর্ব প্রকার বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিভাগরহিত এক অবিনাশী আত্মাকে দর্শন করেন, সেই জ্ঞানকে বলা হয় সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥২০॥

রাজসিক জ্ঞান কাকে বলে, ভগবান?

যে জ্ঞানে মানুষ পৃথক পৃথক সমস্ত প্রাণীতে আত্মাকে পৃথক পৃথকভাবে দেখে, তাকে বলে রাজসিক জ্ঞান ॥২১॥

তামসিক জ্ঞান কোনটি?

যা উৎপন্ন হওয়া শরীরেই পূর্ণের মত করে আসক্ত এবং যা যুক্তিসংগত নয়, তাত্ত্বিক জ্ঞানরহিত ও তুচ্ছ, সেই জ্ঞান 'হল তামস জ্ঞান ॥২২॥

তিন প্রকার কর্মের মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম কোনটি, ভগবান?

যে নিয়ত (নির্দিষ্ট) কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত মানুষের দ্বারা রাগ-দ্বেষ ও কর্তৃত্বাভিমান রহিত হয়ে করা হয়, তাকে বলে সাত্ত্বিক কর্ম ॥২৩॥

রাজসিক কর্ম কোনটি?

যে কর্ম ভোগেচ্ছাযুক্ত মানুষের দ্বারা অহঙ্কার অথবা পরিশ্রমপূর্বক শুরু করা হয়, তাকে বলে রাজসিক কর্ম ॥২৪॥

তামসিক কর্ম কোনটি?

যে কর্ম পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও নিজ সামর্থ্য না বুঝে মোহপূর্বক আরম্ভ করা হয়, তাকে বলে তামসিক কর্ম ॥২৫॥

তিন প্রকার কর্তার মধ্যে সাত্ত্বিক কর্তা কাকে বলে, ভগবান?

যে ব্যক্তি আসক্তিরহিত, অহং-অভিমানবর্জিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকেন, তিনিই হলেন সাত্ত্বিক কর্তা ॥২৬॥

রাজসিক কর্তা কিরূপ হন?

যে ব্যক্তি রাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসুক, অশুদ্ধ ও হর্ষ-শোকযুক্ত, তাঁকে বলা হয় রাজসিক কর্তা ॥২৭॥

তামসিক কর্তা কাকে বলে?

যে ব্যক্তি অসতর্ক, কর্তব্যাকর্তব্য শিক্ষাবর্জিত, জেদী, একগুঁয়ে, কৃতঘ্ন, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী, তাঁকে বলা হয় তামসিক কর্তা ॥২৮॥

জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার তিন প্রকার বিভিন্নতার কথা আপনি বলেছেন, এছাড়া আর কী কী পার্থক্যের কথা জানা দরকার?

হে ধনঞ্জয়! কর্ম সংগ্রাহক করণগুলির মধ্যে বুদ্ধি এবং ধৃতি হল মুখ্য, সেগুলির পার্থক্য জানা খুবই দরকার। এখন তুমি গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার পার্থক্য পৃথকভাবে শোনো, আমি তা তোমাকে সম্পূর্ণভাবে জানাচ্ছি। হে পৃথানন্দন! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষ ঠিকমত জানতে পারে, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥২৯-৩০॥

রাজসী বুদ্ধি কাকে বলে?

হে পার্থ! যে বুদ্ধি ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্যও ঠিকভাবে জানে না, তা হল রাজসী বুদ্ধি ॥৩১॥

তামসী বুদ্ধি কি?

হে পৃথানন্দন! তমোগুণে আবৃত যে বুদ্ধি ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম ও সমস্ত বিষয় বিপরীতভাবে বোঝে তাকে বলে তামসিক বুদ্ধি ॥৩২॥

সাত্ত্বিক ধৃতি কিরূপ হয়, ভগবান?

হে পার্থ! সমত্বযুক্ত যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মানুষ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করেন, তাকে বলে সাত্ত্বিক ধৃতি ॥৩৩॥

রাজসিক ধৃতি কাকে বলে?

হে পৃথানন্দন! ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কামকে অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক ধারণ করে, তাকে বলা হয় রাজসিক ধৃতি ॥৩৪॥

তামসিক ধৃতি কেমন হয়?

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধৃতির সাহায্যে নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে না, সেই ধৃতিকে বলা হয় তামসিক ধৃতি ॥৩৫॥

তামস পুরুষ নিদ্রাদি ত্যাগ করেন না কেন?

কেননা সে এতে সুখ অনুভব করে।

সে সুখ কেমন, ভগবান?

হে ভরতর্ষভ! সেই সুখেরও তিন প্রকার বিভাগের কথা আমার কাছে

শোনো। যে সুখের অভ্যাস অর্থাৎ অনুশীলন দ্বারা মানুষ প্রীত এবং পরিতৃপ্ত হয় এবং যার দ্বারা দুঃখের অন্ত হয়, এরূপ পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে উৎপন্ন হয় যে সুখ, সাংসারিক আসক্তির জন্য যা প্রারম্ভে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতবৎ, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক সুখ ॥৩৬-৩৭॥

রাজসিক সুখ কোনটি ভগবান?

যে সুখ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়ের সংযোগে প্রারম্ভে অমৃতের ন্যায় কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, তা হল রাজসিক সুখ ॥৩৮॥

তামসিক সুখ কেমন হয়?

নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হতে উৎপন্ন যে সুখ প্রারম্ভে এবং পরিণামে স্ব-স্বরূপকে মোহগ্রস্ত করে, তাকে বলা হয় তামসিক সুখ ॥৩৯॥

ভগবান, এখন আপনি বলুন যে এই তিনটি গুণের জন্য আর কোন কোন বস্তুর তিন প্রকার বিভেদ হয়?

ভাই! পৃথিবী, স্বর্গ, দেবতাদের মধ্যে কিংবা অন্য কোথাও এমন কোনও বস্তু, পদার্থ নেই যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিনটি গুণ থেকে মুক্ত অর্থাৎ সমস্ত ত্রিভুবনই এই তিনটি গুণের অধীন ॥৪০॥

এই গুণ হতে মুক্তি পাবার উপায় কী ভগবান?

হে পরন্তপ! এই জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারটি বর্ণের বিভাগ মানুষের স্বভাবজাত গুণাদি অনুসারে করা হয়েছে। সুতরাং নিজ নিজ বর্ণানুসারে নিয়ত কর্ম (স্বধর্ম) অনুষ্ঠিত করাই এই গুণাদি থেকে মুক্ত হবার উপায় ॥৪১॥

ব্রাহ্মণের কর্ম কী, ভগবান?

১) মন নিগ্রহ করা, ২) ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা, ৩) ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার করা, ৪) বাহ্যান্তর শুচি রাখা, ৫) অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, ৬) কায়-মনো-বাক্যে সরল থাকা, ৭) বেদ-শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান সম্পাদন করা, ৮) যজ্ঞাবিধি অনুভব করা, ৯) পরমাত্মা, বেদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস রাখা—এ সবই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম বা লক্ষণ ॥৪২॥

ক্ষত্রিয়ের কর্ম কোনগুলি?

১) শৌর্য, ২) তেজ বা বীর্য, ৩) ধৈর্য, ৪) প্রজা প্রতিপালনে দক্ষতা, ৫) যুদ্ধে পশ্চাদাপসরণ না করা, ৬) মুক্ত হস্তে দান, ৭) শাসন-করার

ক্ষমতা—এগুলি হল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম ॥৪৩॥

বৈশ্যের কর্ম কী?

(১) চাষ করা, (২) গো-রক্ষা ও (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য করা—বৈশ্যদের এই হল স্বাভাবিক কর্ম ॥

শূদ্রের কর্ম কোনটি?

চার বর্ণের মানুষের সেবা করাই শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৪ ॥

নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম করলে কী হয়, ভগবান?

নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্মে যাঁরা নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে লেগে থাকেন, তাঁরা যেভাবে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেন, তা আমার কাছে শোনো ॥৪৫॥

সেই প্রকারটি কী?

যে পরমাত্মা হতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা এই জগৎ সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত, তাঁকে নিজ কর্মের দ্বারা পূজা করে মানুষ সিদ্ধি (পরমাত্মা) প্রাপ্ত হয় ॥৪৬॥

নিজ কর্মের অনুষ্ঠানই কেন করা উচিত ভগবান?

ভাই! যা নিজের জন্য নিষেধ করা হয়েছে তাতে নানা গুণাবলী থাকলেও সেই গুণযুক্ত পরধর্ম অপেক্ষা নিজ দোষযুক্ত ধর্ম (স্বভাবজ কর্ম) শ্রেষ্ঠ ; কেননা স্বাভাবিকভাবে করা স্বধর্মরূপ কর্ম করলে মানুষ পাপভোগী হয় না। হে কুন্তীনন্দন! দোষণীয় হলেও নিজ ধর্ম কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ আগুন জ্বলার সময় প্রথমে যেমন ধোঁয়া হয়, তেমনই প্রত্যেক কর্মের প্রারম্ভেই কোনও না কোনও দোষ দেখা যায় ॥৪৭-৪৮॥

কর্মে আংশিকভাবেও যাতে কোনও দোষ না হয়, এমন কোনও উপায় কি আছে, ভগবান?

হ্যাঁ আছে, তা হল সাংখ্যযোগ। যাঁর বুদ্ধি সর্বত্র সর্বতোভাবে আসক্তিরহিত হয়ে থাকে, যাঁর শরীর নিজ বশে থাকে এবং যাঁর কোনও বস্তু ইত্যাদির বিন্দুমাত্র পরোয়া থাকে না, এরূপ ব্যক্তি সাংখ্যযোগ সহযোগে নৈষ্কর্ম-সিদ্ধি (পরমব্রহ্ম) প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ তাঁর সকল কর্মই অকর্ম হয়ে যায় এবং কর্মের আংশিক কোনও দোষও তাঁর লাগে না ॥৪৯॥

সেই নৈষ্কর্ম সিদ্ধিলাভ করার কোনও ক্রম কি আছে?

চিত্তের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে, জ্ঞানের পরা নিষ্ঠাকে যে ক্রমের দ্বারা লাভ করেন, তা তুমি আমার থেকে সংক্ষেপে জেনে নাও। যিনি সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত, বৈরাগ্য আশ্রিত, নির্জনে বসবাসকারী, পরিমিতাহারী হয়ে ধৈর্য সহকারে ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে, শরীর-মন-বাক্যকে বশীভূত করে, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করে এবং রাগ-দ্বেষ বর্জন করে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে, মমত্ব বর্জন করে, শান্ত হয়ে, ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠেন ॥৫০-৫৩॥

এরূপ উপযুক্ত পাত্র হলে কী হয়, ভগবান?

সেই ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত সাধক কারও জন্য শোকও করেন না এবং কোনও কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না, সকল প্রাণীতে তিনি সমভাবাপন্ন হন। এরূপ সাধকই আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হন ॥৫৪॥

পরাভক্তি প্রাপ্ত হলে কী হয়?

পরাভক্তি প্রাপ্ত হলে তিনি, আমি কী ও কেমন, তা স্বরূপত জেনে তৎকালে আমাতে প্রবেশ করেন ॥৫৫॥

আপনাকে লাভ করার আর কোনও উত্তম উপায় আছে কি?

হ্যাঁ, অতি উত্তম উপায় আছে।

সেটি কী মহারাজ?

যিনি অনন্যভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সর্বদা সকল কর্ম করলেও আমার কৃপায় নিত্যস্থিত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন ॥৫৬॥

আমার তাহলে কী করা উচিত?

ভাই! তুমি মৎপরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ কর অর্থাৎ সমস্ত কর্ম, পদার্থ ইত্যাদি থেকে তোমার আপন-ভাব সরিয়ে নাও এবং সমত্ব আশ্রয় করে নিত্য আমাতে চিত্ত রাখ। ॥৫৭॥

আপনাতে চিত্ত রাখলে কী হবে?

আমাতে চিত্ত অর্পণ করলে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে। কিন্তু যদি তুমি অহঙ্কারবশত আমার কথা না শোনো, তবে তোমার পতন হবে ॥৫৮॥

পতন হবে কী করে?

অহঙ্কারবশত তুমি যুদ্ধ না করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, তা মিথ্যা ; কেননা তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে। হে কুন্তীনন্দন! নিজ স্বভাবজ কর্মে আবদ্ধ হয়ে তুমি মোহবশত যে যুদ্ধে যোগ দিতে চাইছ না, তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাববশতই তা তুমি বাধ্য হয়ে করবে ॥৫৯-৬০॥

এই ক্ষাত্র-স্বভাব কীভাবে যুদ্ধ রূপ কর্মে নিয়োজিত করে, ভগবান?

হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। তিনি তাঁর মায়া দ্বারা শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীকে তাদের স্বভাব অনুসারে ঘোরাতে থাকেন ॥৬১॥

এই মোহজাল থেকে নির্গত হবার উপায় কী?

হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি সর্বভাবে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁর কৃপায় তোমার সংসারে সর্বতোভাবে উপরতি এবং অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্তি হবে। তোমাকে আমি এই অতি গুহ্য শরণাগতিরূপ জ্ঞান জানালাম। এখন তুমি ভালভাবে চিন্তা করে যেমন ইচ্ছা, সেইভাবে কর ॥৬২-৬৩॥

ভগবান, আমি তো নিজের ইচ্ছায় কোনও কিছুই করতে চাই না। আপনিই বলুন আমি কী করব?

তাহলে তুমি আমার এই গুহ্যতম পরম বচন আবার শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার মঙ্গলের কথা আমি বলছি ॥৬৪॥

ভগবান, কী সেই হিতের (মঙ্গলের) কথা?

তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। এরূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে— আমি তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক তা জানাচ্ছি ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥৬৫॥

ভগবান, আমি যদি তা না করতে পারি, তাহলে?

সকল ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে তুমি শুধুমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সর্ব পাপ হতে মুক্ত করব। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না ॥৬৬॥

আপনি তো অত্যন্ত সহজ এবং উৎকৃষ্ট পথ জানালেন, ভগবান, আমি এ-কথা সকলকে জানাতে পারি কি?

না ভাই! এই অতি গুহ্য কথাটি অসহিষ্ণু ব্যক্তিদের বোলো না ; যারা আমার ভক্ত নয় তাদেরও কখনও বোলো না ; যারা এসব বিষয় শুনতে চায় না তাদেরও বোলো না এবং যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টিসম্পন্ন, তাদেরও বোলো না ॥৬৭॥

এছাড়া আপনি আর যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি কাদের বলা উচিত?

আমার ভক্তদের বলা উচিত। যেসব ব্যক্তি আমার পরাভক্তির উদ্দেশ্যে এই পরম গোপনীয় গীতাগ্রন্থটি আমার ভক্তদের শোনাবেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হবেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মত আমার প্রিয় কার্য সাধনকারী মানুষের মধ্যে আর কেউই হবেন না এবং ভূমণ্ডলেও তাঁদের মত আর কেউ আমার প্রিয় নয় ॥৬৮-৬৯॥

আর যদি কেউ এমন কাজ করতে সক্ষম না হয়, তবে?

যাঁরা আমার ও তোমার এই ধর্মময় আলোচনা অধ্যয়ন করবেন, তাঁদের দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হব—এই আমার মত ॥৭০॥

যদি কেউ অধ্যয়ন করতে না পারেন, তাহলে, ভগবান?

দোষবর্জিত হয়ে যাঁরা শুধুমাত্র শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই উপদেশ শ্রবণ করবেন, তাঁরাও সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে পুণ্য কর্মকারীদের উচ্চলোকে প্রাপ্ত হবেন ॥৭১॥

হে পার্থ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি এই উপদেশ একাগ্রচিত্তে শুনেছ? এবং হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান-জাত মোহ কি নাশ হয়েছে? ॥৭২॥

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি স্মৃতিলাভ করেছি, কিন্তু এসবই হয়েছে আপনার কৃপায়, উপদেশ শোনার জন্য নয়! আমি সন্দেহ মুক্ত হয়েছি, এখন আমি আপনার আদেশ পালন করব ॥৭৩॥

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্। এইভাবে আমি ভগবান বাসুদেব এবং মহাত্মা অর্জুনের এবম্বিধ রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শুনেছি ॥৭৪॥

সঞ্জয়! তুমি কী প্রকারে এই কথোপকথন শুনলে?

আমি শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় এই গোপনীয় কথোপকথন সাক্ষাৎ যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনেছি, কোনও লোক পরম্পরাতে নয় ॥৭৫॥

এই কথোপকথনে তোমার ওপর কী প্রভাব হয়েছে, সঞ্জয়?

হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এরূপ পবিত্র ও অদ্ভুত বার্তালাপ স্মরণ করে আমি বারংবার হর্যোৎফুল্ল হয়ে উঠছি ॥৭৬॥

হর্যোৎফুল্ল হয়ে ওঠার আর কী কারণ?

হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যন্ত বিরাটরূপ স্মরণ করে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি এবং বারংবার হর্ষ বোধ করছি ॥৭৭॥

সঞ্জয়, এখন তুমি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছালে?

যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে গাণ্ডীব-ধনুকধারী অর্জুন আছেন সেখানেই শ্রী, বিজয় এবং অচল নীতি বিরাজমান—এই হল আমার নিশ্চিত অভিমত ॥৭৮॥

❖ ❖ ❖